

জগন্নিব বর্গত

হেমেন্দ্রবর্মান রায়



জয়ন্তের বর্ণিত

রহস্যময় চুরি

সকালবেলা। শীতকাল। খিড়কির ছোট বাগানের একপাশে, একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে জয়ন্ত একমনে বিলাতি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছে আর তার গায়ের উপর দিয়ে খেলা করে যাচ্ছে, কাঁচা সোনার মতো কচি রোদের মিষ্টি হাসিটুকু।

এমনসময় মানিকলাল উধ্বশ্বাসে সেখানে ছুটে এসে বললে, জয়, জয়—

জয়ন্ত বই থেকে মুখ তুলে বললে, হয়েছে কি? অমন করে ছুটে আসছ কোথেকে?

মুকুন্দ নন্দীর গদি থেকে।

কিন্তু ছুটে আসছ কেন? কেউ তোমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে নাকি?

ইজিচেয়ারের হাতলের উপর বসে পড়ে মানিকলাল বললে, হুঃ, আমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে, এ অঞ্চলে এমন লোক তো কাউকে দেখি না। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে আসছি তোমাকে একটা মস্ত খবর দেওয়ার জন্যে। কাল মুকুন্দ নন্দীর গদিতে একটা রহস্যময় চুরি হয়ে গেছে!

জয়ন্ত সিঁধে হয়ে বসে বললে, রহস্যময় চুরি?

হুঁ। এই দেখো খবরের কাগজ।

তুমি পড়ে শোনাও।

মানিকলাল খবরের কাগজ থেকে পড়ে শোনাতে লাগলঃ

রহস্যময় চুরি

গতকল্য গভীর রজনীতে বাগবাজারের শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল নন্দীর গদিতে এক রহস্যময় চুরি হইয়া গিয়াছে। গদির কার্য শেষ হইয়া যাইবার পর মুকুন্দবাবু যথারীতি হিসাব মিলাইয়া শয়ন করিতে যান। গদিতে সেদিন অনেক টাকার কাজ হইয়াছিল এবং সে টাকা লোহার সিন্দুকের ভিতরে তুলিয়া রাখা হইয়াছিল। সিন্দুকের পাশেই মুকুন্দবাবুর এক কর্মচারী শয়ন করিয়াছিল। গভীর রাত্রে হঠাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কে তাহাকে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া জানালা দিয়া দ্বিতলের উপর হইতে নিম্নতলে নিক্ষেপ করে। ভাগ্যক্রমে জানালার নিচেই মেদি পাতার ঝোপ ছিল, তাই তাহার উপরে পড়িয়া লোকটি অজ্ঞান হইয়া গেলেও তাহার আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। জ্ঞানেনাদয়ের পর তাহার আত্মনাদে গদির আর সকলকার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাহার মুখ হইতে সমস্ত শুনিয়া মুকুন্দবাবু তখন লোহার সিন্দুকের ঘরে যান। কিন্তু ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তখন দ্বার ভাঙিয়া ফেলা হয়। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সকলে দেখেন যে, লোহার সিন্দুকের দরজা ভাঙা, ভিতরে টাকাকড়ি কিছুই নাই। একটা জানলার চারিটা লোহার শিক দুমড়াইয়া কে বা কাহারো খুলিয়া ফেলিয়াছিল, -শিকগুলি বাড়ির বাহিরে জানালার ঠিক নীচেই পাওয়া গিয়াছে। চোরেরা যে এই ভাঙা জানালা দিয়াই ভিতরে ঢুকিয়া আবার বাহির হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই। মুকুন্দবাবুর প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা সিন্দুক হইতে অদৃশ্য হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ জোর তদন্ত শুরু করিয়াছে।

জয়ন্ত সমস্ত শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বললে, আচ্ছা মানিকলাল, মাসতিনেক আগে ভবানীপুরের এক বড় জুয়েলারের দোকান থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার অলঙ্কার চুরি যায়, মনে আছে?

আছে। কিন্তু সে চুরির সঙ্গে এ-চুরির সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক হয়তো কিছুই নেই। কিন্তু সে-চুরির সঙ্গে এ-চুরির মিল আছে অনেকটা।

হ্যাঁ, তা বটে। চোরেরা সেখানেও জানলার লোহার গরাদ ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল আর লোহার সিন্দুকের কপাট ভেঙে গহনা নিয়ে পালিয়েছিল-ঠিক কথা।

জয়ন্ত বললে, কেবল তাই নয়, একজন দারোয়ানকে ধরে তুলে এমন আছাড় মেরেছিল যে তার প্রাণ প্রায় যায় যায় হয়েছিল।

মানিকলাল উৎসাহিত হয়ে বললে, ঠিক, ঠিক! তুমি কি বলো, সেই চোরের দলই কাল মুকুন্দ নন্দীর গদিতে এসে হানা দিয়েছে?

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, আমি এখন ওসব কিছুই বলতে চাই না। আমি এখন খালি জানতে চাই যে, মুকুন্দ নন্দীর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে কি না?

মানিকলাল বললে, হা, অল্প-স্বল্প আলাপ-পরিচয় আছে বইকী! মুকুন্দবাবু আমাকে তো চেনেনই, তোমারও খ্যাতি তাঁর অজানা নেই। এইমাত্র আমি যখন গদি থেকে আসি, তিনিও আমার সঙ্গে তোমার কাছে আসতে চাইছিলেন।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলো, তাহলে আর দেরি করে কাজ নেই, একবার গদিটা দেখেই আসি।

.

বেনামা চিঠি

এইবার আগে জয়ন্ত আর মানিকলের একটুখানি পরিচয় দেওয়া দরকার।

জয়ন্তের বয়স একুশ-বাইশের বেশি হবে না-তবে তার লম্বা-চওড়া চেহারার জন্যে বয়সের চাইতে তাকে অনেক বেশি বড় দেখায়। তার মতন দীর্ঘদেহ যুবক বাঙালি জাতির ভিতরে বড় একটা দেখা যায় না-তার মাথার উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি। ভিড়ের ভিতরেও সে নিজেকে লুকোতে পারত না, সকলের মাথার উপরে জেগে থাকত তার মাথাই।

রীতিমতো ডন-বৈঠক, কুস্তি, জিমনাস্টিক করে নিজের দেহখানিকেও সে তৈরি করে তুলেছিল। বাঙালিদের ভিতরে সে একজন নিপুণ মুষ্টিযোদ্ধা বলে বিখ্যাত। আপাতত এক জাপানি মল্লের কাছ থেকে যুযুৎসুর কৌশল শিক্ষা করছে।

মানিকলাল বয়সে জয়ন্তের চেয়ে বছর দুই-এক ছোট হবে। নিয়মিত ব্যায়ামাদির দ্বারা যদিও তারও দেহ খুব বলিষ্ঠ, কিন্তু তার আকার সাধারণ বাঙালিরই মতন ইচ্ছে করলেই সে আর পাঁচজনের ভিতরে গিয়ে অনায়াসেই আপনাকে লুকিয়ে ফেলতে পারত।

জয়ন্ত ও মানিকলাল দুজনেই এক কলেজে পড়াশুনা করত-কিন্তু নন-কো-অপারেশন আন্দোলনের ফলে তারা দুজনেই কলেজি পড়াশুনো ত্যাগ করেছিল। তারা দুজনেই পিতৃ-মাতৃহীন, কাজেই স্বাধীন। দুজনেরই কিছু কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে, কাজেই তাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ও নেই।

ছেলেবেলা থেকেই তাদের ভারি শখ, বিলাতি ডিটেকটিভের গল্প পড়বার। এসব গল্প তারা একসঙ্গে বসেই পড়ত এবং গল্প শেষ হলে তাদের ভিতরে উত্তপ্ত আলোচনা চলত। এডগার অ্যালেন পো, গেবোরিও, কন্যান ডইল ও মরিস লেল্লাঙ্ক প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের কাহিনি তো তারা একরকম হজম করেই ফেলেছিল এবং হাতে সময় থাকলে অবিখ্যাত লেখকদেরও রচনাকে তারা অবহেলা করতে পারত না। কিন্তু তাদের কাছে উপাস্য দেবতার মতন ছিলেন কন্যান ডইল সাহেবের দ্বারা সুপরিচিত ডিটেকটিভ শার্লক হোমস।

একটি বোতাম, এক টুকরো কাগজ বা একটা ভাঙা চুরোটের পাইপের মতন তুচ্ছ জিনিস দেখে শার্লক হোমস বড় বড় চুরির বা খুনের আসামিকে ধরে ফেলতে পারতেন, জয়ন্ত ও মানিকলাল রুদ্ধশ্বাসে তার সেই বাহাদুরির কথা পাঠ করত এবং বসে বসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। দেখত, তারাও যেন গোয়েন্দা হয়ে শার্লক হোমসের মতন তুচ্ছ সূত্র ধরে বড় বড় চুরি-রাহাজানি খুনের কিনারা করে ফেলে লোকের চোখে তাগ লাগিয়ে দিচ্ছে।

এইভাবে আলোচনা করতে করতে ক্রমে তাদের পর্যবেক্ষণশক্তি এতটা বেড়ে উঠল যে, পাড়ার কয়েকটা ছোটখাটো চুরির আসামিকে পুলিশের আগেই ধরে ফেলে সত্য-সত্যই সবাইকে অবাক করে দিলে। তারপর একটা শক্ত খুনের কেসে তারা খুবই নামজাদা হয়ে পড়ল। পুলিশ যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল, সেই সময়েই কেসটা হাতে নিয়ে জয়ন্ত হাঙ্গামাকানেকের ভিতরে খুনিকে ধরে পুলিশের কবলে সমর্পণ করেছিল!...এইরকম আরও চার-পাঁচটা জটিল চুরি ও খুনের রহস্য ভেদ করে জয়ন্ত ও মানিকালের নাম এখন চারিদিকেই সুপরিচিত।

জয়ন্ত ও মানিকাল এসেছে শুনে মুকুন্দবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাদের খুব আদর করে গদির ভিতরে নিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত বললে, আমাদের একেবারে চুরির ঘরে নিয়ে চলুন। আমি বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে চাই না।

যে-ঘরে চুরি হয়েছিল সে-ঘরে ঢুকে জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলে। ভাঙা লোহার সিন্দুকটা পরীক্ষা করে বললে, আচ্ছা, এই সিন্দুক ভাঙার শব্দেও আপনাদের ঘুম ভেঙে যায়নি?

মুকুন্দবাবু বললেন, আমার ঘুম খুব সজাগ আর আমি পাশের ঘরেই থাকি। অথচ শুনলে আপনি অবাক হবেন যে, কাল আমার ঘুম ভাঙেনি!

আপনার যে কর্মচারী আহত হয়েছেন, তিনি এখন কোথায়?

হাসপাতালে!

কারা তাকে আক্রমণ করেছিল, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেছেন?

সে বিশেষ কিছুই বলতে পারেনি, কারণ, অন্ধকারে সে কারুকেই দেখতেই পায়নি। তবে যখন তাকে জানলা গলিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন সে চকিতের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল যে, নীচে চার-পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

হু বলে জয়ন্ত একটা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সে জানলার আগে ছয়টা লোহার শিক ছিল, এখন মাত্র দুইটা অবশিষ্ট আছে। জয়ন্ত একটা শিক ধরে টেনে বুঝল, এরকম চার-চারটে শিক দুমড়ে খুলে ফেলা বড় সামান্য শক্তির কাজ নয়। হঠাৎ সেই শিকের এক জায়গায় তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। শিকটার লোহার গায়ে একটু চিড় খেয়েছে, এবং সেইখানেই একগোছা কটা চুল বা লোম আটকে রয়েছে। জয়ন্ত সাবধানে ও সযত্নে সেই চুলের গোছা টেনে নিয়ে একখানা কাগজে মুড়ে পকেটের ভিতরে রাখলে এবং একটি শামুকের নস্যদানি থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে নাকের ভিতরে গুঁজে দিলে।

মানিকাল জানত, জয়ন্ত যখনই মনে মনে কোনও কারণে খুশি হয়ে ওঠে, তখন এক টিপ নস্য না নিয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু আপাতত তার খুশি হবার কোনও কারণ আবিষ্কার করতে না পেরে, এগিয়ে এসে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কী?

জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললে, একটা ভালো সূত্র পেয়েছি। বৈকালে বলব।

মুকুন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওকী জয়ন্তবাবু, এখনি চললেন যে?

জয়ন্ত বললে, আমার যা জানবার তা জেনেছি। নতুন কিছু ঘটনা ঘটলে আমাকে তখনই জানাবেন।

মুকুন্দবাবু বললেন, অবশ্যই তা জানাব। জয়ন্তবাবু, আপনার শক্তির কথা আগেই শুনেছি। দেখবেন, আমাকে যেন ভুলবেন না। পুলিশের চেয়ে আমি আপনাকে বেশি বিশ্বাস করি। পুলিশ ঘুষ খায়, আপনি খাঁটি লোক।

জয়ন্ত ফিরে রুম্বস্বরে বললে, আমি খাঁটি লোক, আপনি তা জানলেন কি করে? মিছে। তোষামোদ আমি ভালোবাসি না।

রাস্তায় এসে জয়ন্ত বললে, মানিকলাল, বাড়িতে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করেই আবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো-বলেই সে হনহন করে এগিয়ে গেল।

মানিকলাল নিজের বাড়ির পথ ধরে অগ্রসর হল। যখন সে প্রায় বাড়ির কাছে এসে পড়েছে, হঠাৎ একজন লোক পিছন থেকে তার নাম ধরে ডাকলে।

মানিকলাল ফিরে দেখলে, কিন্তু তাকে চিনতে পারলে না।

লোকটা বললে, আপনারই নাম তো মানিকবাবু?

মানিকাল ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

আপনার নামে একখানা চিঠি আছে, এই নিন।

মানিকলাল হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলে। খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করে পড়লেঃ

মানিকবাবু আমাদের চোখ সর্বত্র। মুকুন্দ নন্দীর গদিতে চুরি হইয়াছে তো আপনাদের কি? যদি প্রাণের মায়া রাখেন, এ ব্যাপার থেকে সরিয়ে দাঁড়ান। না হলে, মৃত্যু অনিবার্য।

পত্রে লেখকের নাম নেই।

পত্র দেখে দৃষ্টি তুলে মানিকলাল দেখলে, যে চিঠি নিয়ে এসেছিল সে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে!

মানিকলের আর নিজের বাড়িতে যাওয়া হল না, সে আবার জয়ন্তের বাড়ির দিকে ছুটল।

দুই হাতের উপর মুখ রেখে জয়ন্ত চুপ করে টেবিলের সামনে বসে ছিল।

মানিকলাল ঘরে ঢুকেই চিঠিখানা টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে বললে, জয়, আর-এক নতুন কাণ্ড!

জয়ন্ত একটুও নড়ল না, চিঠির দিকে তাকিয়েও দেখলে না। সহজ ভাবেই বললে, চিঠিতে কি লেখা আছে আমি তা জানি।

জানো?

হ্যাঁ। আমিও এখনি ওইরকম একখানা চিঠি পেয়েছি।

.

একটি বেশি-খুশি মনুষ্য

মানিকলাল সবিস্ময়ে বললে, তুমিও এইরকম একখানা চিঠি পেয়েছ?

হ্যাঁ।

যে চিঠি দিয়েছে তাকে ধরতে পারোনি?

না। কিন্তু তার চেহারা দেখে নিয়েছি, তাকে আবার দেখলেই চিনতে পারব। তবে আমার বিশ্বাস চিঠি সে লেখেনি, সে পত্রবাহক ছাড়া আর কেউ নয়।

তোমার এ বিশ্বাসের কারণ কি?

কারণ, চিঠিখানা এরই মধ্যে আমি কিছু কিছু পরীক্ষা করে দেখেছি। - এই বলে জয়ন্ত টেবিলের উপর থেকে মানিকলের চিঠিখানাও তুলে নিলে, তারপর হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

পাশের ঘরটি হচ্ছে জয়ন্তের পরীক্ষাগার। মানিকাল বুঝলে, তার চিঠিখানা ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যেই জয়ন্ত ও-ঘরে গেল। সে চুপ করে বসে আজকের ঘটনাগুলো নিয়ে মনে-মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল কিন্তু কোনও সূত্রই আবিষ্কার করতে পারলে না।

খানিকক্ষণ পরেই জয়ন্ত পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অন্যমনস্ক ভাবে যেন নিজের মনেই বললে, না, কোনও সন্দেহ নেই-কোনও সন্দেহ নেই!

মানিক বললে, তোমার কথার অর্থ কি জয়?

জয়ন্ত চেয়ারের উপরে বসে পড়ে এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, এই চিঠি দুখানা যে লিখেছে, তার সম্বন্ধে কতকগুলি দরকারি কথা, আমি জানতে পেরেছি।

যথা?

শোনো? পত্রলেখক বাঁ-হাতে চিঠি লিখেছে। যাঁরা হাতের লেখা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁরা সকলেই জানেন, ডান-হাতের আর বাঁ-হাতের লেখার ছাঁদ হয় আলাদা রকম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পত্রলেখক বাঁ-হাত ব্যবহার করেছে কেন? তুমি হয়তো মনে করবে, সে তার ডানহাতের লেখা লুকোবার জন্যেই বাঁ-হাতে লিখে আমাদের ফাঁকি দিতে চেয়েছে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে অনভ্যাসের জন্যে বাঁ-হাতের চিঠি লেখবার তিনটি কারণ থাকতে পারে। এক ও কারুর কারুর মতন সে হয়তো দুই হাতেই চিঠি লিখতে পারে। দুই ও কারুর কারুর মতন তার হয়তো ডান-হাতের চেয়ে বাঁ-হাতই ভালো চলে। তিন ও হয়তো তার ডান হাত নেই বা থাকলেও অকর্মণ্য, কাজেই তাকে বাঁ-হাতে লেখার অভ্যাস করতে হয়েছে।

মানিকলাল বললে, আর কিছু জানতে পেরেছ?

জয়ন্ত বললে, পেরেছি বইকী। ভালো করে লক্ষ করবার সময় পেলে তুমিও বুঝতে পারতে যে, পত্রলেখক ফাউন্টেন পেনে, সবুজ কালিতে লেখে। খাম আর চিঠির কাগজ কীরকম পুরু আর দামি দেখেছ তো? সাধারণ লোক চিঠি লেখার জন্যে এত অর্থ ব্যয় করে না, আবার অনেক ধনী লোকেও করে না; সুতরাং পত্রলেখক কেবল ধনী নয়, বিলাসীও। এই চিঠি লিখে সে মস্ত ভ্রম করেছে, আমাদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি? সে বাঙালি, ধনী, বিলাসী আর বাঁ-হাতে লেখে।

অপরাধীকে ধরবার জন্যে আমাদের আর কলকাতার নানান জাতের লোকের পিছু নিতে হবে না।

মানিকলাল বললে, কিন্তু কলকাতায় বাঙালির সংখ্যাও তো কম নয়।

জয়ন্ত টেবিলের উপরে নস্যদানিটা ঠুকতে ঠুকতে বললে, মানিক, আমি আরও কিছু কিছু দরকারি কথা জানতে পেরেছি। অপরাধী যদি ইউরোপের লোক হত তাহলে কখনও চিঠি লিখে আমাদের এমন করে শাসাতে সাহস করত না। ইউরোপের পুলিশকে বিজ্ঞান এখন শাসন করে! চোর-ডাকাত-খুনিদের বিরুদ্ধে সেখানকার পুলিশ এখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বসে প্রমাণ সংগ্রহ করে। অপরাধীদের ব্যবহৃত ছোটখাটো কোনও জিনিস দেখেও অনেক রহস্য ধরে ফেলা যায়। পত্রলেখক আমাকে চেনে, কিন্তু আমারও যে কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার আছে এটা জানলে সে চিঠি লেখবার সময় আরও বেশি সাবধান হত! মানিক, পত্রলেখক হচ্ছে হয় রাসায়নিক, নয় তার টেবিলের উপরে নানারকম রাসায়নিক চূর্ণ ছড়ানো থাকে।

তাই নাকি, তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমি খুব শক্তিশালী অনুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলুম, চিঠির খামের পিছনদিকের তিন-চার রকম রাসায়নিক চূর্ণ লেগে রয়েছে সাদা চোখে তা দেখা যায় না। খুব সম্ভব, পত্রলেখক জল দিয়ে খাম ঐটে সেখানাকে টেবিলের উপরে চেপে ধরেছিল-লোকে প্রায়ই যা করে থাকে। সাদা চোখে অদৃশ্য ওইসব রাসায়নিক চূর্ণ তার টেবিলের উপরে ছড়ানো ছিল তারই কিছু কিছু খামের গায়ে লেগে গিয়েছে।

মানিকলাল চমৎকৃত হয়ে বললে, এ যে আলিবাবার গল্‌পের কুনকের সঙ্গে মোহর উঠে আসার মতো হল!

হ্যাঁ, প্রায় সেই রকমই বটে। এখন বুঝে দেখো, কোনও সাধারণ লোকের টেবিলেই নানারকম রাসায়নিক চূর্ণ ছড়ানো থাকে না। সুতরাং আমাদের এই প্রেরক যে কেমিস্ত্রি

নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানিক, সে বাঁ-হাতে ফাউন্টেন পেনে সবুজ কালিতে লেখে আর আমাদের কার্যকলাপ সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে।

মানিকলাল বললে, তাহলে এটাও বুঝতে হবে যে, সে আমাদেরও নাগালের বাইরে নেই।

জয়ন্ত বললে, এই চিঠি দুখানিই সে-প্রমাণও দিচ্ছে।

মানিকলাল হাসতে হাসতে বললে, এইবারে আমার মাথাও একটু একটু করে খুলছে। মুকুন্দ নন্দীর গদিতে আমরা বেশিক্ষণ ছিলাম না। কিন্তু আমরা বাড়ি আসবার পথেই এই চিঠি দুখানা পেয়েছি। পত্রলেখক নিশ্চয়ই খুব কাছেই ছিল।

জয়ন্ত বললে, খুব কাছে-হ্যাঁ, কাছের এক বাড়িতে।

মানিকলাল বললে, বাড়িতে?

নিশ্চয়! বাড়ির নামে তুমি যখন সন্দেহ করছ, তখন তোমার বুদ্ধি খুলতে এখনও দেরি আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা গাড়িতে বসে চিঠি লিখলে খামের পিছনে ওই রাসায়নিক গুঁড়োগুলো উঠে আসত কি?

মানিক উৎসাহ ভরে বলে উঠল, ঠিক, ঠিক, ঠিক! অপরাধী তাহলে বাগবাজারেই থাকে, তাকে গ্রেপ্তার করা শক্ত হবে না!

জয়ন্ত গম্ভীর ভাবে বললে, এত সহজেই উৎসাহিত হোয়ো না মানিক! চারে মাছ থাকলেই সে যে ডাঙায় উঠবে, এমন কোনও কথা নেই। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, অপরাধী চিঠি লিখে অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। কিন্তু ওকথা এখন থাক, আমার আর একটা আবিষ্কারের কথা শোনো। দেখো দেখি, এটা কী? এই বলে সে টেবিলের উপর ছোট একটি কাগজের মোড়ক তুলে মানিকের দিকে এগিয়ে দিলে।

মোড়ক খুলে মানিক দেখলে, এক টুকরো শুকনো মাটি।

জয়ন্ত বললে, কিছু বুঝতে পারছ?

মানিক বললে, দেখে মনে হচ্ছে, গঙ্গামাটি।

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, ঠিক বলেছ। মুকুন্দ নন্দীর গদির যে জানলার গরাদ ভেঙে চোরেরা ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল, সেই জানালায় এই মাটিটুকু লেগে ছিল-ভিতর দিকে নয়, বাইরের দিকে। অমন জায়গায় গঙ্গামাটি থাকার কারণ কি? খুব সম্ভব, চোরদের কারুর পায়ে তা ছিল, ঘরে ঢোকবার সময়ে জানালার গায়ে লেগে গিয়েছে।

মানিক অল্পক্ষণ ভেবে বললে, মুকুন্দ নন্দীর গদি বাগবাজারের অনুপূর্ণা ঘাট থেকে বেশি দূরে নয়। তবে কি চোরেরা গঙ্গার দিক থেকে এসেছে?

সবাই এসেছে কিনা জানি না, তবে একজন যে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।...জয়ন্ত হঠাৎ চমকে উঠে সামনের জানালা দিয়ে পথের দিকে তাকালে, তারপর বললে, মানিক, ওই দেখো, যে আমাকে চিঠি দিয়ে গেছে, সে ওই পথ দিয়ে যাচ্ছে।

মানিক তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে দেখলে, একজন ময়লা কাপড়পরা নিম্নশ্রেণির লোক রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। সে উত্তেজিত স্বরে বললে, আমরাও যেন মনে হচ্ছে ওই লোকটাই আমাকে চিঠি দিয়ে গেছে।

জয়ন্ত বললে, মানিক, ওকে এখানে ডেকে আনতে পারো?

যদি না আসে?

জোর করে ধরে আনবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, গায়ের জোরের দরকার হবে না। ও-লোকটা বোধ হয় চোরদের দলের লোক নয়, দেখছ না ওর ভাবভঙ্গি কেমন নিশ্চিন্ত।

জয়ন্তের কথাই সত্য। মানিক গিয়ে ডাকবামাত্রই লোকটা তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে। এল বিনা আপত্তিতে। জয়ন্ত শুধোলে, তুমি কোথায় থাকো?

কুমোরটুলিতে।

কী করো?

চায়ের দোকানে চাকরি করি, খাই-দাই আর বেড়িয়ে বেড়াই।

বেশ, বেশ, তা হলে তুমি তো দেখছি বেশ খুশিতে আছ।

তা আর থাকব না মোশয়! আমি কারুর কোনও ধার ধারি না, একটা বই পেট নয়, ভাবনা-চিন্তে কিছুই নেই! তার ওপরে আজকে আবার বেশি খুশিতে আছি।

বেশি খুশিতে আছ! কেন বল দেখি?

তা যেন বলছি, কিন্তু আপনারা এত কথা জানতে চাইছেন কেন?

তোমাকে আরও বেশি খুশি করব বলে। তুমি নগদ একটাকা রোজগার করবে?

কে দেবে?

আমি!

আমায় কি করতে হবে?

আগে তোমার এত খুশির কারণ শুনি, তারপর বলব।

তবে শুনুন মোশয়! আজ সকালে গঙ্গার ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরছি, হঠাৎ এক বাবু এসে আমাকে বললে, ওই যে দুজন লোক দুদিকে চলে যাচ্ছে ওদের একজনের নাম জয়ন্ত, আর একজনের নাম মানিক। ওদের এই চিঠি এক-একখানা দিয়ে যদি ছুটে পালিয়ে আসতে পারিস, তাহলে নগদ একটাকা বকশিশ পাবি।

আমি তখনই রাজি হয়ে গেলুম, এ আর

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এখন আমার কথা শোনো। সেই বাবুটিকে কেমন দেখতে, তোমার মনে আছে কি? সে বুঝলে, এই বেশি খুশি লোকটি আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাদের কারুকেই চিনতে পারেনি।

লোকটা বললে, খুব খুঁটিয়ে বলতে পারব না মোশয়! তবে তার রং কালো নয় আর দেহ খুব লম্বা-চওড়া, আর,

আর? থামলে কেন, বলো না।

বাবুটি যখন আমাকে টাকা দেয় তখন আমি দেখেছিলুম, তার ডান-হাতের বুড়ো আঙুলটা নেই।

মানিক সচমকে জয়ন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু জয়ন্তের মুখ স্থির।

লোকটা বললে, এখন আমাকে কি করতে হবে মোশয়?

জয়ন্ত পকেট থেকে একটা টাকা বার করে লোকটার হাতে দিয়ে বললে, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, তুমি এখন যাও।

লোকটা অবাক হয়ে খানিকক্ষণ জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, বোম মহাদেব। মা লক্ষ্মী দেখছি আজ টাকা বৃষ্টি করছেন।

জয়ন্ত বললে, শুনলে মানিক, তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল নেই! কাজেই তাকে বাঁ হাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করতে হয়েছে!

মানিক অভিভূত স্বরে বললে, জয়, জয়, তুমি কি জাদুকর!

জয়ন্ত বললে, মানিক, ভগবান সবাইকে চোখ দিয়েছেন, কিন্তু সবাইকে সমান দেখবার ক্ষমতা দেননি। যেমন সকলেই লিখতে পারলেও সকলেই কবিতা লিখতে পারে না,

তেমনি সকলেই দেখতে পেলেও সকলেই আসল জিনিসটুকু দেখতে পায় না। আমি জাদুকর নই ভাই, আমি তোমার বন্ধু!-এই বলে সে খুব বড় এক টিপ নস্য নাকের গর্তে গুঁজে দিল।

ধুলো-হাওয়া-ভক্ষণ

বৈকালবেলায় মানিক যখন আবার জয়ন্তের কাছে ফিরে এল তখন দেখলে, সে ইজিচেয়ারে চোখ মুদে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

মানিক শুধোলে, এখনও তোমার ঘুম ভাঙেনি নাকি? বেলা যে পড়ে এল!

চোখ না খুলেই জয়ন্ত বললে, বীরপুরুষ, তুমি সজাগ আছ দেখে আমার সাহস বাড়ল। চোখ মুদলেই মানুষ যে ঘুমোয়, তোমাকে এ শিক্ষা কে দিলে?

মানিক বললে, মানুষ ঘুমোলেই চোখ মোদে।

জয়ন্ত বললে, মানুষ যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সে বসে থাকে না। কিন্তু মানুষ যখন দাঁড়িয়ে থাকে না, তখন সে বসতেও পারে, শুতেও পারে, দৌড়োতেও পারে। মানুষ যখন চোখ মুদে থাকে, তখন সে ঘুমোতেও পারে কিংবা জেগে চিন্তা করতেও পারে।

তাহলে তুমি চিন্তা করছিলে?

জয়ন্ত চোখ খুলে বললে, হ্যাঁ, গভীর চিন্তা। মুকুন্দ নন্দীর গদির চোরেরা যে পথ দিয়ে শুভাগমন করেছে, আমার মন সেই পথে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

তাহলে পথ চিনতে পেরেছ?

হয়তো পেরেছি, হয়তো পারিনি। চল, একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে জোলো হাওয়া আর পথের ধুলো খেয়ে আসি। বলেই জয়ন্ত জামা পরতে লাগল।

জয়ন্তের জোলো হাওয়া আর পথের ধুলো খাবার আগ্রহ মানিক আর কোনওদিন দেখেনি। সুতরাং সে আন্দাজ করে নিলে তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।

দুজনে মিনিট-পনেরো গঙ্গার ধারে এদিক-ওদিক করে বেড়ালে। তারপর অল্পপূর্ণা ঘাটের কাছে এসে জয়ন্ত বললে, ধুলো আর হাওয়া খেয়ে পেট ভরে গিয়েছে। এখন এইখানে একটু বসে-বসে গঙ্গার ঢেউ গোনা যাক!

দুজনে গঙ্গার ধারে বসে পড়ল। সেখানটায় পাশাপাশি খড়ের নৌকোর পরে খড়ের নৌকো সাজানো রয়েছে, খড়বোঝাই প্রত্যেক নৌকোকে এক একখানা কুঁড়েঘরের মতন দেখাচ্ছে- হঠাৎ তাকালে মনে হয়, গঙ্গার বুকে যেন এক ভাসন্ত পল্লীগ্রাম বিরাজ করছে। এ-জায়গাটা খালি অল্পপূর্ণা ঘাট নয়, খোঁড়া ঘাট বা বিচিলি ঘাট নামেও পরিচিত-প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খড়ের দালাল, মুটে-মজুর, গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ও মাঝি-মাল্লাদের হইচই আর গুণগোলে এখানে কেউ কান পাততে পারে না।

এখন সে-সব গোলমাল আর নেই। বাঁধানো পাড়ের উপরে বসে পাঁচ-ছজন দাঁড়ি ও মাঝি গল্পগুজব করছিল, জয়ন্ত খুব সহজেই তাদের ভিতর গিয়ে আলাপ জমিয়ে ফেললে।

কথায় কথায় জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা ভাই, ঘাটের ঠিক গায়েই ওই যে খড়ের নৌকোখানা রয়েছে, ওখানা কার?

একজন বললে, আমার, বাবু।

খানিকক্ষণ জয়ন্ত তাদের আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। মানিকের দিকে ফিরে বললে, মানিক, বয়ার কাছে একখানা বড় বজরা বাঁধা রয়েছে, দেখেছ?

বজরাখানা ইতিমধ্যেই মানিকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কারণ হচ্ছে, এত বড় ও এমন সুন্দর চিত্রবিচিত্র শৌখিন বজরা গঙ্গার বুকে আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

বজরাখানা তারা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে দেখে একজন মাঝি বললে, বাবু, ও বজরাখানা কাল বিকাল থেকে এই ঘাটেই বাঁধা ছিল। আজ দুপুরে ওখানাকে বয়ার কাছে নিয়ে গেছে।

জয়ন্ত বললে, চমৎকার বজরা! ওখানা কার তা জানো?

না বাবু। ওরকম বজরা আমি এখানে আর কখনও দেখিনি। তবে বজরার ভিতরে তিন-চারজন বাঙালিবাবু আর একজন হাবসি লোককে আমি দেখেছি।

জয়ন্ত অকারণেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, ঠিক দেখেছ? হাবসি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু, হাবসি! মাথায় বেজায় উঁচু, দেহ যেন লোহা দিয়ে তৈরি, গায়ের রং কয়লার মতো, উঃ, দেখলেই ভয় হয়।

জয়ন্ত নস্যদানি বার করে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মাঝিদের দলের একটা লোক আর একজনকে ডেকে বললে, দ্যাখ ভাই ছিদু! ওই বজরার লোকগুলো বোধহয় কাল সারা রাত ঘুমোয়নি।

ছিদু বললে, কেমন করে জানলি তুই?

আমারও যে কাল রাতে ঘুম হয়নি! ওই বজরার লোকগুলো কাল রাতে তিন-চারবার ডাঙায় নেমেছিল।

জয়ন্ত বললে, ওঠো মানিক, এইবারে আরও দু-চার পা বেড়িয়ে বাড়ি ফেরা যাক।

দুজনে কাশি মিত্রের ঘাটের দিকে অগ্রসর হল।

জয়ন্ত হঠাৎ মাঝের আর-একটা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে বললে, একখানা পানসি নিয়ে জলবিহারে রাজি আছো?

মানিক হেসে ফেলে বললে, বুঝেছি হে, বুঝেছি। ওই বজরার কাছে না গিয়ে তুমি আর থাকতে পারছ না।

জয়ন্তও হেসে বললে, তুমি দেখছি অন্তর্যামী হয়ে উঠেছ!

তখনই একখানা পানসি ভাড়া করা হল, মাঝি শুধোলে, কোন দিকে যাব বাবুজি?

ওই বজরার কাছ দিয়ে এগিয়ে চলো।

দুজনে প্রথমটা বজরার দিকে তাকিয়ে নীরবে বসে রইল। তারপর মানিক বললে, মাঝিদের মুখে যা শুনলুম, বজরার লোকগুলোর ব্যবহার সন্দেহজনক বলেই মনে হচ্ছে। ওরকম বজরা কোথা থেকে এখানে এল, আর কেনই বা এই ঘাটে এসে লেগেছিল? কাল সারারাত বার বার ওরা ঘাটে নেমেছিল কি কারণে? মুকুন্দ নন্দীর গদি এখান থেকে বেশি দূরে নয়, কাল সেখানে চুরি হয়ে গেছে!

জয়ন্ত ভাবতে-ভাবতে বললে, হু, আর বজরায় একজন হাবসি আছে।

যদিও বাঙালির সঙ্গে হাবসি-জাতের লোক বড় একটা দেখা যায় না, তবু তার নামেই একটু আগে তুমি এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে কেন?

তোমার মনে আছে মানিক, মুকুন্দ নন্দীর গদির জানালায় গরাদের উপরে কয়েকগাছা চুল আমি পেয়েছি? সে চুল আমি অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করে দেখেছি। চুলগুলো এমন কোকড়ানো আর পুরু যে, কাফ্রি-জাতের লোকের মাথার চুল না হয়ে যায় না।

মানিকও অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, বলো কি জয়! এত বড় প্রমাণ তুমি পেয়েছ?

প্রমাণটা এতক্ষণ খুব বড় ছিল না, বরং এই চুলগুলো ব্যাপারটাকে আরও বেশি রহস্যময় করে তুলেছিল। বাংলাদেশে বাঙালির গদিতে হাবসির মাথার চুল অস্বাভাবিক নয় কি? এই চুলগুলোর জন্যে সমস্ত ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছিল, মাঝিদের কথায় এতক্ষণে সব স্পষ্ট হয়ে গেল। বলতে বলতে গঙ্গাতীরের দিকে চেয়ে জয়ন্ত হঠাৎ চমকে উঠে থেমে পড়ল।

মানিকও সেইদিকে তাকিয়ে দেখলে, গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে একজন লোক একটা লাল নিশান নিয়ে ঘন ঘন নাড়ছে।

জয়ন্ত বললে, মানিক, ও-লোকটা বজরার লোকদের সঙ্কেতে কিছু জানাচ্ছে!

মানিক বললে, বোধ হয় আমরা ওদিকে যাচ্ছি সেই খবরই দিচ্ছে!

জয়ন্ত বললে, খুব সম্ভব তাই। মানিক, এবার যদি ওই বজরার গিয়ে উঠতে পারি!

পানসি তখন বজরার খুব কাছে এসে পড়েছে। জয়ন্ত ও মানিক দেখলে, বজরার ছাদের উপর প্রকাণ্ড আকারের একটা লোক মস্তবড় এক পাথরের মূর্তির মতো স্থির ভাবে বসে আছে- তার লক্ষ্য স্থির হয়ে আছে যে পানসি এগিয়ে আসছে তার দিকে।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, মানিক, রিভলভারটা আনতে ভোলেনি তো?

মানিক বললে, না।

.

কালো আঁধারে, কালো ঝড়ে, কালো গঙ্গায়

সূর্য তখন অস্ত গেছে,-পশ্চিমের ভাঙা ভাঙা মেঘের গায়ে আলোময় আলতার ছোপ মাখিয়ে। আকাশ থেকে আলতা-আলো ঝরে পড়ে গঙ্গাজলকেও রঙিন করে তুলেছে-সে জল যেন পিচকারিতে ভরে নিলে অনায়াসেই হোলিখেলা করা চলে।

বজরাখানা ভালো করে দেখবার মতোই বটে। দোতলা বজরা-তাকে ছোটখাটো একখানা ভাসন্ত বাড়ি বলাও চলে। দেওয়ালগুলো লাল রঙের ও জানলা-দরজাগুলোর রং সবুজ। ছাদগুলো চকচকে পিতলের রেলিং দিয়ে ঘেরা। মাঝে-মাঝে রঙিন টবে চারা বসিয়ে বাগান রচনারও চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসব চারার থোলো থোলো নানারঙা ফুল ফুটে বজরাখানাকে দেখতে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

বজরার একতলায় ছাদের উপরে বসে সেই পাথরের মতো স্থির মস্ত মূর্তিটা তখনও নিষ্পলক চোখে পানসির গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। বজরার আর কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

পানসি এগিয়ে যাচ্ছিল, জয়ন্ত হঠাৎ চৈঁচিয়ে বললে, মাঝি, নৌকোখানা বজরার চারদিকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে চলো। চমৎকার বজরা। আমি আরও ভালো করে দেখতে চাই।

জয়ন্তের কথা বজরার উপরকার সেই মূর্তিটা শুনতে পেলো। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল। একেবারে ধারে এসে, পিতলের রেলিংয়ের উপরে ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে বললে, আপনারা আমার বজরা দেখতে চান? বেশ তো, বজরার উপরেই আসুন না, বাইরে থেকে দেখবেন কেন?

লোকটার গলার আওয়াজ কি গম্ভীর! এমন অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বর শোনাই যায় না।

জয়ন্তের দিকে ফিরে মানিক চুপিচুপি বললে, ওহে, লোকটা আবার আমাদের ডাকে যে, এখন কি করবে?

জয়ন্ত চৈঁচিয়ে বললে, আমরা বজরার উঠলে আপনি তাহলে রাগ করবেন না?

রাগ? রাগ করব কেন? আপনাদের মতো আরও অনেকেই আমার বজরা দেখতে আসেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য!-বলেই সে ফিরে ডাকলে, ওরে, কে আছিস রে!

একটা জোয়ান পশ্চিমী লোক ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সেলাম করলে।

লোকটা বললে, বাবুদের ওপরে তুলে নে! সব ঘর ভালো করে দ্যাখা।

বজরার উপরে উঠে জয়ন্ত ও মানিক বুঝলে, এ একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার বটে! বজরার মালিকের শখও আছে, টাকাও আছে। এর কামরার যেসব ছবি, পোর্সিলেনের আসবাব, সোফা, কৌচ, ডাইনিং টেবিল ও কার্পেট প্রভৃতি চোখে পড়ে, অনেক নামজাদা ধনীর বাড়িতেও তার তুলনা মেলে না।

একতলার একটা ঘরে বসে কয়েকজন পশ্চিমী লোক গল্পগুজব করছিল। জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের কারুর ভিতর থেকে সন্দেহজনক কোনও কিছু আবিষ্কার করতে পারলে না।

দোতলার একটা ঘরে ঢুকে দেখা গেল, যার আমন্ত্রণে তারা বজরায় এসেছে, সেই লোকটি টেবিলের সামনে একখানা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে।

এই যে, আসুন! সব কামরা দেখা হল? কেমন দেখলেন!

জয়ন্ত বললে, চমৎকার! আজকাল এরকম বজরা চোখেই পড়ে না। বজরার মালিক বোধ হয় আপনিই?

হ্যাঁ। এখনকার বাবুদের শখ হচ্ছে লঞ্চ আর মোটরবোট কেনা। আমি ওসব কল কবজার জিনিস দু-চক্ষে দেখতে পারি না। একটা কল বিগড়োলেই সব অচল!

জয়ন্ত লোকটাকে ভালো করে দেখতে লাগল। লোকটির বয়স হবে বছর চল্লিশ। রং উজ্জ্বল শ্যাম, দেহ যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, দেখলেই শক্তিমান বলে বোঝা যায়। দুই চোখের দৃষ্টি এমন তীব্র যে, বেশিক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, বসুন।

জয়ন্ত ও মানিক এক-একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

মানিক দেখলে, জয়ন্ত একদৃষ্টিতে একটা শেলফের দিকে চেয়ে আছে। সেও সেইদিকে চেয়ে দেখলে, শেলফে-র উপর কতকগুলো ইংরেজি বই সাজানো রয়েছে-সব বই-ই রসায়ন তত্ত্ব বিষয়ক। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল, যে-ব্যক্তি তাদের ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছে, জয়ন্তের বিশ্বাস সেও কেমিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করে। মানিক বুঝতে পারল, জয়ন্ত অমন করে বইগুলো লক্ষ করছে কেন!

টেবিলের এককোণে রয়েছে একটা বক-যন্ত্র। জয়ন্ত হাত দিয়ে অন্যমনস্কভাবে সেটা নাড়তে নাড়তে বললে, এখানে এ জিনিসটা কেন?

লোকটি হেসে বললে, আমার একটি বাতিক আছে। আমি কেমিস্ট্রি নিয়ে অল্প স্বল্প নাড়াচাড়া করি।

জয়ন্ত বললে, আমারও কেমিস্ট্রি শিখতে ইচ্ছে হয়। আপনি যদি দয়া করে ও-সম্বন্ধে দু-চারখানা বইয়ের নাম লিখে দেন, তাহলে বাধিত হই।

লোকটি বললে, এ আর শক্ত কথা কি, এখনই দিচ্ছি।-বলেই টেবিলের টানার ভিতর থেকে কাগজ ও কলম বার করে খানকয় বইয়ের নাম লিখে কাগজখানা জয়ন্তের হাতে থেকে কাগজ, এ আর শক্ত

জয়ন্ত বললে, ধন্যবাদ! আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করলুম, কিন্তু মহাশয়ের নাম আমরা জানি না।

আমার নাম ভবতোষ মজুমদার। কলকাতায় বাগবাজারে থাকি।

এমনসময় নীচে থেকে পানসির মাঝির চিৎকার শোনা গেল-বাবুজি, আকাশে মেঘ জমেছে, এখনি ঝড় উঠবে, শিগগির আসুন।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনার বজরা দেখে বড় খুশি হলুম, আজ তাহলে আসি, নমস্কার।

কামরা থেকে বাইরে বেরিয়েই তারা দেখলে, সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতরে আধখানা আকাশ জুড়ে মেঘের কালিমা ঘন হয়ে উঠেছে। কষ্টিপাথরের উপরে ক্ষণস্থায়ী সুবর্ণরেখার মতো থেকে থেকে বিদ্যুতের দীপ্ত লীলা দৃষ্টিকে ঝলসে দিচ্ছে।

মাঝি বললে, বাবুজি, ঝড় এল বলে। আপনারা এখন পানসিতে আসবেন কি?

জয়ন্ত পানসিতে নেমে পড়ে বললে, ঝড়কে আমরা ভয় করি না, পানসি চালাও।

মানিক বললে, জয়, কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হল না, মেঘগুলো কীরকম হু-হু করে এগিয়ে আসছে তা দেখেছ?

দেখেছি। কিন্তু মানিক, ঝড়ের সময়ে এই গঙ্গার চেয়ে ওই বজরা যে আরও ভয়ানক হয়ে উঠত না, তাই-বা কে বলতে পারে?

মানিক সচমকে বললে, তোমার এমন সন্দেহের কারণ?

সকালে আমরা যে দুখানা চিঠি পেয়েছি, তার কথা তুমি ভেলোনি বোধহয়?

না।

সেই চিঠি দুখানা ওই বজরার ভিতরে বসেই লেখা হয়েছে।

মানিক বললে, তোমার বিশ্বাস, সেই চিঠি দুখানার লেখক, কেমিস্ট্রি নিয়ে চর্চা করে। ভবতোষ যে কেমিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করে তাও স্বকর্ণেই শুনলুম বটে। এইটুকু প্রমাণই যথেষ্ট নয়।

জয়ন্ত বললে, সে কথা আমিও জানি। কিন্তু আমি তার চেয়েও বেশি কিছু জানতে পেরেছি। এই কাগজখানা দেখছ? ভবতোষ তোমার সামনেই এই কাগজে কতকগুলো বইয়ের নাম লিখে দিয়েছে। আর এই দেখো সেই চিঠি দুখানা!-এই বলে সে পকেটে হাত দিয়ে সকালের সেই চিঠি দুখানা বার করলে।

মানিক কাগজ দুখানা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে করতে বললে, ভবতোষ লিখেছে কালো কালিতে ইংরেজি হরফে, আর চিঠির লেখা বাংলায় সবুজ কালিতে। তোমার মতে, চিঠির লেখা- বাঁ-হাতের। কিন্তু ভবতোষ তো আমার সামনেই ডানহাতে লিখলে! এই কাগজের লেখার সঙ্গে চিঠি লেখার কোনও মিলই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

জয়ন্ত বলল, আরও ভালো করে দেখো মানিক, আরও ভালো করে দেখো!

মানিক হঠাৎ সবিস্ময়ে বলে উঠল, এ কী ব্যাপার! চিঠিখানার কাগজ আর ভবতোষের কাগজ যে একেবারে এক।

জয়ন্ত কাগজখানা আর চিঠি আবার পকেটের ভিতরে পুরে ফেলে সহাস্যে বললে, ভায়া, তোমার চোখ একটু দেড়িতে ফোটে দেখছি! ভবতোষের কাগজ আর চিঠির কাগজ যে এক, আমি তো সেটা মিলিয়ে দেখবার আগেই টের পেয়েছিলুম। এই চিঠি দুখানা ভবতোষ নিজে লেখেনি বটে, কিন্তু চিঠির কাগজ সরবরাহ করেছে সে নিজের হাতেই! খুব সম্ভব, চিঠি দুখানা লেখা হয়েছে তার হুকুমের। মানিক, ও-বজরা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

মানিক বললে, ওই ঝড় উঠল।

হাঁ, ঝড় উঠল-আর সে বড় সহজ ঝড় নয়। ভীষণ কালো মেঘের দল সারা আকাশকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করবার আগেই আচম্বিতে উন্মত্ত ঝটিকা গোঁ-গোঁ শব্দে চিৎকার করে উঠল। এবং তার পরেই ছুটে এল চোখ কানাকরা রাশি রাশি ধুলোর কণা-সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার জল খেপে উঠে খলখল-খল অউহাস্যে প্রলয় নাচ শুরু করে দিলে। এক মুহূর্তের মধ্যেই আকাশ বাতাস-পৃথিবীর রূপ গেল একেবারে বদলে। সন্ধ্যার অন্ধকারে, মেঘের অন্ধকারে, ধুলোর অন্ধকারে-চোখে কিছু দেখা যায় না; বজ্রের গর্জনে, ঝড়ের হুঙ্কারে, তরঙ্গের কোলাহলে- কানে কিছু শোনা যায় না। বাতাসের ও জলের টানে পানসিখানা কোনদিকে ছুটে চলেছে তিরবেগে, তা কেউ বুঝতেও পারলে না।

সেই হটগোলের ভিতরেও জয়ন্তের তীক্ষ্ণ কান আর একটা শব্দ আবিষ্কার করলে। হঠাৎ চোখ তুলেই সে দেখলে, একখানা মোটর বোট একেবারে পানসির উপর এসে পড়েছে। আর রক্ষা নেই।

মানিক, মানিক! লাফিয়ে পড়ো-জলে লাফিয়ে পড়ো।-প্রাণপণে চেষ্টা করে এই কথা বলেই মানিককে টেনে নিয়ে জয়ন্ত গঙ্গার সেই মৃত্যু-স্রোতের ভিতরে আঁপিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে মোটরবোটখানা ভীষণ শব্দে পানসির উপরে বিষম এক ধাক্কা মারলে। দাড়ি মাঝিরা তীক্ষ্ণস্বরে আত্ননাদ করে উঠল, এবং পানসিখানাও চোখের নিমেষে উলটে গেল।

জয়ন্ত ও মানিক জলের উপরে ভেসে উঠেই দেখলে, মোটরবোটখানা আবার তাদের দিকে বেগে ছুটে আসছে।

জয়ন্ত, আবার চেষ্টা করে বললে, মানিক, ও মোটরবোট আমাদেরই বধ করতে চায়। আবার ডুব দাও,-ডুব সাঁতারে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করো।

দপ করে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল, এবং ডুব দেবার পূর্বমুহূর্তে জয়ন্ত ও মানিক দুজনেই সচমকে দেখলে, মোটরবোট চালিয়ে আসছে মূর্তিমান যমের মতন কালো একটা কাফ্রি!

গরম খিচুড়ি

ডুব দিয়ে তারা সেই উন্মত্ত জলরাশি ঠেলে খানিকদূর এগিয়ে গেল। কিন্তু জলের ভিতরে দম বন্ধ করে মানুষ আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে? মিনিটখানেক পরেই আবার তাদের উপরে ভেসে উঠতে হল, হাঁপ ছাড়বার জন্যে।

প্রায় অন্ধকারে ঢেউয়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে তারা এস্ত নেত্রে দেখলে, আকাশে চিলেরা যেমন ছোঁ মারবার আগে মণ্ডলাকারে ঘোরে, সেই মোটরবোটখানা গঙ্গার অস্থির ও ফুটন্ত জলে তেমনি চক্র কেটে আবার বেগে ঘুরে আসছে। প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হওয়াতে এবারে তার আরও রোখ বেড়ে উঠেছে।

মেঘ আর ঝড়-আর গঙ্গা তেমনি প্রলয়ের চিৎকারে করছে, পৃথিবীর সর্বাস্থে অন্ধকারে তেমনি কয়লার রং মাখিয়ে দিচ্ছে এবং চারিদিকে ফেনা ছড়াতে-ছড়াতে ও মরণ নাচ নাচতে নাচতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তেমনি নিষ্ঠুর কৌতুকে ছুটে তেড়ে আসছে।

মানিক হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, জয়, আবার ডুব দাও!

জয়ন্ত বললে, এমন বারবার ডুব দিয়ে কতক্ষণ চলবে?

তা ছাড়া আর উপায় কি? ওই দেখো, মোটরবোটখানা আবার এসে পড়ল।

মানিক, আমাদের রিভলবার আছে। শিগগির বার করো!

পরমুহূর্তে অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে দুটো রিভলবার উপর উপর গর্জন করে উঠল। মোটরবোটখানা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো বেগে আসতে-আসতে হঠাৎ মোড় ফিরে আঁধারের ভিতরে গোঁৎ খেয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত বললে, মানিক, রিভলবারের গুণ দেখো। আমাদের কাছে রিভলবার আছে জানলে শত্রু বোধ হয় এতটা বীরত্ব দেখাতে আসত না।

দু-হাতে জল ঠেলতে ঠেলতে মানিক বললে, জয়, তোমার এ অনুমানও সত্য,-ওদের দলে কাফ্রি জাতের লোক আছে।

জয়ন্ত বললে, আমার অনুমান মিথ্যা হওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক। এখনও আমরা নিরাপদ নই। চলো, আগে ডাঙার দিকে চলো।

ঝড় আজ গঙ্গাকে যেভাবে খেপিয়ে তুলেছিল, স্রোতের টান যেরকম প্রখর, তাতে ডাঙার দিকে অগ্রসর হওয়া বড় সহজ কাজ নয়। তারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল বাগবাজারের কাছে, কিন্তু পায়ের তলায় মাটি পেলে নিমতলার ঘাটের কাছে গিয়ে।

তারা যখন পথ দিয়ে বাড়িমুখো হল তখন ঝড়ের আক্রোশ একেবারে কমে গেছে। শূন্য থেকে কালো মেঘের পর্দাও সরে গেল বটে, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হল না, খুব জোরে বৃষ্টি ঝরতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, দেবতা দেখছি আজ আমাদের ওপরে মোটেই খুশি নন। ভেবেছিলুম, ঝড়ের পর আকাশ পরিষ্কার হবে, আর আমিও সেই কাফ্রি-বন্ধুর মোটর-বোটখানা আর একবার খোঁজবার চেষ্টা করব। কিন্তু আজ আর খোঁজাখুঁজি করে কোনও লাভ নেই-চারিদিকে যে অন্ধকার! তবে মোটর-বোটখানা পরেও বোধ হয় আমরা খুঁজে বার করতে পারব।

কেমন করে?

পোর্ট-পুলিশে খবর দিয়ে। মোটরবোট এখানে বেশি নেই। যে কখানা আছে, পোর্ট পুলিশের কাছেই তাদের সন্ধান মিলবে।

মানিক বললে, কিন্তু কোন মোটরবোট আমাদের আক্রমণ করেছিল, কেমন করে তা বুঝতে পারবে?

জয়ন্ত বললে, আমার রিভলভারের গুলিগুলো যে ব্যর্থ হয়নি, আমি তা জানি। তোমারও টিপ খারাপ নয়। আমাদের খুঁজে দেখতে হবে, কোন মোটরবোটের গায়ে গুলির দাগ আছে। এটুকু আবিষ্কার করা বিশেষ কঠিন হবে না, কি বলো হে?

মানিক বললে, আপাতত ও-সব কথা আমার আর ভালো লাগছে না। আমার গায়ের হাড়গুলো পর্যন্ত বোধ হয় ভিজে গেছে। ডাঙায় উঠেও এখনও ভিজতে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো। আগে দু-পেয়ালা গরম চা

তারপর গরম খিচুড়ি। ঠিক বলেছ মানিক, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার বুদ্ধিই বেশি খোলে। চলো বন্ধু, ঘরমুখো বলদের মতো ঘরের দিকেই দৌড় দেওয়া যাক।

হাইড্রোজেন আর্সেনাইড

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙবার পর মানিক ঘরের জানালা খুলে বাইরেটা একবার দেখেই নিজের মনে অপ্রসন্ন স্বরে বললে, উঃ, কী একগুঁয়ে বৃষ্টি! কাল থেকে শুরু হয়েছে, এখনও থামবার নাম নেই!

সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা থেকে জয়ন্তের ডাক শুনলে, মানিক, ওহে মানিক।

তাড়াতাড়ি আবার জানালা খুলে মানিক বললে, কিহে, এত সকালে এই বৃষ্টিতে তুমি কোথেকে আসছ?

মানিক, জামা-কাপড় পরে শিগগির নীচে নেমে এসো।

কথামতো কাজ করে মানিক নীচে নেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কী জয়, আবার কোনও নতুন বিপদ হয়েছে নাকি?

বিপদ? হ্যাঁ। তবে আমাদের বিপদ নয়।

তার মানে?

আমাদের পাড়ার-অর্থাৎ বাগবাজারের, সদানন্দ বসুর নাম শুনেছ বোধহয়? তিনি খুব ধনী হলেও খুব কৃপণ বলেই বিখ্যাত। লোকের বিশ্বাস, সকালে তার নাম করলে ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায়। তাই সবাই তাঁকে হাঁড়ি-ফাটা বসু বলে ডাকে। এই সদানন্দ বসুর বাড়িতে কাল রাতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে।

মস্ত চুরি!

হ্যাঁ! ঘটনাটা আমি লোকের মুখে যতটা জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই : সদানন্দবাবু তার বাড়িতে একলাই বাস করেন; কারণ, সংসারে তার আর কেউ নেই। একমাত্র মেয়ে, সেও শ্বশুরবাড়িতে। বাড়িতে থাকে কেবল একজন চাকর ও একজন দ্বারবান। ঠিকে-পাঁচক রান্না সেরে বাসায় চলে যায়। সদানন্দবাবুও শখ করে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন। এমন শখ তার হয় না, বোধ করি পাস পেয়েছিলেন। থিয়েটারে বড় বড় দুটো পালা ছিল- সারা রাত তার অভিনয় দেখবার কথা। কিন্তু একটা পালা দেখবার পর আর তাঁর ভালো লাগেনি, তাই তিনি রাত সাড়ে বারোটার সময়েই বাড়িতে ফিরে আসেন। দ্বারবান সদর দরজা খুলে দেয়। তিনি সোজা উপরে গিয়ে দেখেন, তার শয়ন-ঘরের দরজা খোলা। অথচ দরজায় তিনি নিজের হাতেই চাবি বন্ধ করে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকেন, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান হলে পর দেখলেন, তার লোহার সিন্দুক ভাঙা, টাকাকড়ি আর মূল্যবান যা-কিছু ছিল, সব অদৃশ্য!

আশ্চর্য! কিন্তু ঘরে ঢুকেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান কেন?

এখনও সেটা জানতে পারিনি।...সদানন্দবাবুর জুয়েলারি ব্যবসা আছে, সুতরাং তার লোহার সিন্দুকে যে হীরে-মুক্তা-চুনি-পান্নার অভাব ছিল না, এটুকু অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি। চোর এসেছিল খিড়কির দরজা দিয়ে। আপাতত এর বেশি আর কিছু জানি

না। সদানন্দবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তিনি আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছেন, পুলিশেও খবর দিয়েছেন।

আরও খানিক পথ চলেই দুজনে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল। তখনও পুলিশ আসেনি, উপরে খবর দিয়ে জয়ন্ত বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল।

শয়ন-ঘরে একখানা ইজিচেয়ারের উপরে সদানন্দবাবুর শুকনো মুখে হতাশভাবে শুয়ে ছিলেন, জয়ন্তকে দেখেই মাথা নেড়ে হাহাকার করে উঠলেন।

সে হাহাকার জয়ন্তের কানে ঢুকল বলে মনে হল না, সে নস্যদানি থেকে নস্য নিতে নিতে ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

ঘরখানি খুব ছোটখাটো, একটা লোহার সিন্দুক ও টুলের উপরে একটা কুঁজো ছাড়া আসবাব-পত্তর আর কিছুখাটো, একটা লেহ করতে লাগল।

লোহার সিন্দুকটা ভালো করে দেখে জয়ন্ত মৃদুস্বরে বললে, মানিক, কলকাতায় বৈজ্ঞানিক চোরের দল ক্রমেই পুরু হয়ে উঠছে। এই লোহার সিন্দুক খোলবার জন্যে oxy-acetylene torch ব্যবহার করা হয়েছে। মুকুন্দ নন্দীর গদিতেও চোরেরা ঠিক এই উপায়ই অবলম্বন করেছিল।

মানিক চমকে উঠে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় নীচে একটা গোলমাল উঠল, তার পরেই সিঁড়ির উপরে একাধিক লোকের পায়ে শব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত বললে, পুলিশ এসেছে। এখনি আমাদের পুরোনো বন্ধু ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হবে।

ইন্সপেক্টার সুন্দরবাবু সদলবলে উপরে এসে হাজির হলেন। সম্ভবত তাঁর পিতৃদেব ঠাটা করেই ছেলের নাম রেখেছিলেন-সুন্দর। কারণ, তার দেহ যেমন বেঁটে তেমনি মোটা এবং গায়ের রং নিগ্রোদের চেয়ে বেশি ফরসা নয়। চোখ আর নাক প্রায় চিনেম্যানদের মতো এবং শোনা যায়, জন্মগ্রহণের পরে তার মাথায় কেউ কোনওদিন একগাছি চুলও দেখতে পায়নি।

জয়ন্তকে দেখেই সুন্দরবাবু একগাল হেসে বললেন, এই যে শখের টিকটিকি ভায়ারা যে! চোরের ঠিকুজি বোধহয় জানতে পেরেছ?

জয়ন্ত বললে, আজ্ঞে না, আপনার আগে চোর ধরব, এমন সাধ্য আমাদের নেই।

সুন্দরবাবু খুশি হয়ে বললেন, তা সত্যিকথা ভায়া। শখের গোয়েন্দাগিরি আর শার্লক হোমসের বাহাদুরি নভেলেই ভালো লাগে, আসলে তার কোনও দামই নেই। যাক সে কথা। কই, কোন সিন্দুক ভেঙে চুরি হয়েছে দেখি!

সিন্দুকটার দিকে তাকিয়েই সুন্দরবাবু বললেন, হুম! ওর ভেতরে কত টাকা ছিল?

সদানন্দবাবু বিহ্বলের মতো হাহাকার করতে লাগলেন।

সুন্দরবাবু ধমক দিয়ে বললেন, ওসব কান্না-টান্না এখন রাখুন মশাই। কাজের কথা বলুন। কী চুরি গেছে?

সদানন্দবাবু অনেক কষ্টে হাহাকার থামিয়ে জানালেন, চোরেরা চারখানা হাজার টাকার নোট ও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না নিয়ে গেছে।

সুন্দরবাবু বললেন, বেশ করেছে। অত টাকার জিনিস এখানে রেখেছিলেন কেন? চোরকে লোভ দেখিয়ে পুলিশের কাজ বাড়াবার জন্যে?...আপনি আর যা জানেন বলুন।

সদানন্দবাবু যা বললেন, জয়ন্তের কাছ থেকে মানিক আগেই তা শুনেছিল।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! কিন্তু ঘরে ঢুকেই আপনি কচিখোকার মতো অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন?

জানি না। কীসের একটা শব্দ হল, আর অমনি আমার সর্বাঙ্গ কীরকম করে উঠল। তারপর কি হল, আমার মনে নেই!

হুম! তাহলে কোনও লোককে আপনি দেখতে পাননি?

কী করে দেখব, ঘরে আলো ছিল না।

তারপর চাকর-দ্বারবানের ডাক পড়ল। তারা কিছুই জানে না।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! সেপাই, এ দুই বেটাকে বেঁধে থানায় নিয়ে চলো...ওকী, জয়ন্ত ভায়া, ঘরের মেঝেয় তুমি হামাগুড়ি দিচ্ছ কেন? তোমার আবার কি হল?

জয়ন্ত ঘরের মেঝে থেকে সযত্নে কিকতকগুলো তুলে একটা কাগজে মুড়ে রেখে বললেন, এখানে অনেক কাচের টুকরো পড়ে রয়েছে। সেগুলো কুড়িয়ে তুলে রাখলুম।

সদানন্দবাবু সবিস্ময়ে বললেন, আমার ঘরে কাচের টুকরো কেমন করে এল?

সুন্দরবাবু বললেন, কই, দেখি একবার টুকরোগুলো!

জয়ন্ত দেখালে। সেগুলো এত ছোট যে, কাচের টুকরো না বলে কাচচূর্ণ বলাই উচিত, খুব পাতলা ও হালকা কাচের গুঁড়ো।

সুন্দরবাবু হা হা করে হেসে উঠে বললেন, ফেলে দাও ভায়া, ফেলে দাও! ওগুলো হীরকচূর্ণ নয় যে এত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছ।

জয়ন্ত বললে, এগুলো হীরকচূর্ণ হলে এত যত্ন করে নিয়ে যেতুম না।

সুন্দরবাবু হতাশভাবে একটা মুখভঙ্গি করে এবং সদানন্দবাবুকে আরও গোটাকয়েক প্রশ্ন করে উঠে দাঁড়ালেন।

জয়ন্ত বললে, সদানন্দবাবু, আপনার জলের কুঁজোর পাশে একটা কাচের গেলাসে আধগ্লাস জল রয়েছে। ও জল কি আপনি পান করেছিলেন।

সদানন্দবাবু বললেন, না। কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি ও-গেলাসটা হাতে করিনি। গেলাসটা তো বরাবর কুঁজোর মুখে ঢাকা দেওয়াই থাকে, ওটাকে নামিয়ে রাখলে কে, তাও জানি না।

জয়ন্ত এক টিপ নস্য নিলে। তারপর সাবধানে গেলাসের তলাটা ধরে জানালার কাছে। গিয়ে দাঁড়াল এবং ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে গেলাসটা পরীক্ষা করতে লাগল।

সুন্দরবাবু একটি ছোটখাটো লাফ মেরে তাড়াতাড়ি বললেন, হুম! সাধু শার্লক হোমস! ও বুদ্ধি তো আমার মাথায় ঢোকেনি। ওতে আঙুলের ছাপ আছে নাকি?

আছে। তবে চোরদের কারুর কিনা জানি না। গেলাসটা আপনি নিয়ে যান, আঙুলের ছাপের ফোটো তুলে দেখবেন, কিছু আবিষ্কার করতে পারেন কিনা!..চলো হে মানিক, আমরা বিদায় হই। হ্যাঁ, ভালো কথা! সুন্দরবাবু, দয়া করে যদি একবার আমার বাড়িতে আসেন, তাহলে আপনাকে একটা খুব দরকারি নতুন কথা শোনাতে পারি।

সুন্দরবাবু বললেন, তোমার কথা যদি নভেলের রূপকথা না হয়, তাহলে আমি যেতে পারি। মনে রেখো, আমরা পুলিশের লোক, রূপকথা শোনবার সময় নেই।

জয়ন্ত হেসে বললে, বেশ বেশ, আপনি যে পুলিশের একজন ছোটখাটো কর্তা, সে কথা আমি ভুলব না। আসতে আজ্ঞা হোক।

সকলে যখন জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল, তখনও বৃষ্টি থামেনি। সুন্দরবাবুকে বৈঠকখানায় বসিয়ে জয়ন্ত বললে, মানিক, তুমি সুন্দরবাবুদের সঙ্গে মিনিটকয়েক গল্প করো। আমি একবার পরীক্ষাগারের ভিতরে যেতে চাই।

সুন্দরবাবু অত্যন্ত ছটফটে লোক, চুপ করে বসে থাকা তার পক্ষে মস্ত শাস্তি। তিনি টেবিলের উপর থেকে একবার খবরের কাগজ তুলে নিলেন, দু-এক লাইন পড়েই আবার কাগজখানা ফেলে দিলেন। একবার একটা জানালা খুললেন, তারপর জলের ছাঁট আসছে দেখে জানালাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে বললেন, হুম! মানিক ভায়া, আমার প্রতিমূর্ত মূল্যবান। আর আমি অপেক্ষা করতে পারব না!

মানিক বললে, ওই যে, চা আর টোস্ট নিয়ে এসেছে, একটু খেয়ে দেখুন না।

সুন্দরবাবু তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে বললেন, হ্যাঁ, এ প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। আরও খান দুই টোস্ট পেলেও আমি আপত্তি করব না।

মানিক হেসে বললে, খালি টোস্ট কেন, আপনি ডিম খান? মুরগির ডিম?

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! মুরগির ডিম হচ্ছে উপাদেয় খাদ্য।

বেয়ারা তখনি আরও টোস্ট ও মুরগির ডিম দিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু চা ও খাবার নিঃশেষ করে অত্যন্ত খোশমেজাজে মুখ পুঁছতে-পুঁছতে বললেন, এরপরে জয়ন্ত ভায়া যদি গোটা দুই রূপকথা বলেন, তাহলে পুলিশের লোক হয়েও আমি রাগ করব না!

এমনসময় জয়ন্ত ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল-তার হাতে সেই কাগজের মোড়কটা। সে বললে, সুন্দরবাবু, এগুলো কি জানেন? কাচের বালবে-র ভাঙা টুকরো! এর ভেতরে কি ছিল জানেন? হাইড্রোজেন আর্সেনাইড..ও কী, ও কী!

হঠাৎ একটা খড়খড়ির পাখি খোলার শব্দ হল-তার পরেই আরও তিন-চারটে অদ্ভুত শব্দ।

চোখের পলক না ফেলতেই জয়ন্ত দুটো প্রবল ধাক্কায় সুন্দরবাবু ও মানিককে ঘরের দ্বারপথ দিয়ে বাইরে ঠেলে দিলে এবং সেইসঙ্গে নিজেও একলাফে বাইরে গিয়ে পড়ল।

ঠেলা সামলাতে না পেরে মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবু ঠিকরে একেবারে উঠানে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়লেন। কোনওরকমে উঠে বসে যন্ত্রণাবিকৃত ত্রুদ্বন্ধস্বরে সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত! এর অর্থ কী?

জয়ন্ত শান্তস্বরে বললে, এর অর্থ আর কিছুই নয়, ও-ঘরে আর এক সেকেন্ড থাকলে হয়তো আমরা প্রাণে মারা পড়তুম!

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বললেন, প্রাণে মারা পড়তুম?

হ্যাঁ। হাইড্রোজেন আর্সেনাইড।

.

স্বপ্নের অগোচর বিভীষিকা

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, কি বললে? হাইড্রোজেন আর্সেনাইড?

হ্যাঁ।

সে আবার কি?

একরকম মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস। সদানন্দবাবুর ঘরে যে কাচের টুকরোগুলো পেয়েছি, সেগুলো যে খুব ছোট কাচের বালবে-র অংশ, একথা আগেই বলেছি। সেইরকম বালবের ভিতরে হাইড্রোজেন আর্সেনাইড ভরে কেউ এইমাত্র আমাদেরও ঘরে ফেলে দিয়ে গেছে।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। নভেল পড়ে পড়ে তোমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

জয়ন্ত মুখ টিপে হেসে বললে, সুন্দরবাবু, আমার মাথা নিয়ে আপাতত আপনি আর মাথা ঘামাবেন না। ব্যাপারটার গুরুত্ব এখনও আপনি আন্দাজ করতে পারেননি। আমরা যখন সদানন্দা বাবুর বাড়ি থেকে আসি, চোরদের কেউ নিশ্চয় আমাদের পিছু নিয়েছিল। হঠাৎ আমি দেখলুম, জানালার খড়খড়ি তুলে ঘরের ভিতরে কে কি ছুঁড়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে বালব ফাটার শব্দ! তখন সবে আমি পরীক্ষা করে আন্দাজ করেছি সদানন্দবাবুর কাল রাতে ঘরে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন কেন! কাজেই চোখের পলক ফেলবার আগেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি আপনাদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে-অর্থাৎ পালিয়ে এলুম। একটু দেরি হলে আর রক্ষে ছিল না!

সুন্দরবাবু অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, হুম! একটু দেরি হলে কি হত শুনি?

হয়তো আমরা প্রাণে বাঁচতুম না।

হুম! কিন্তু সদানন্দবাবু তো কেবল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন!

সদানন্দবাবু ঘরে ঢুকেই খোলা দরজার কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। চোরেরা ঠিক সময়ে বালব ছুঁড়তে পারেনি। বন্ধঘরে হাইড্রোজেন আর্সেনাইড গ্যাস অব্যর্থ। সদানন্দবাবু খোলা দরজার কাছে ছিলেন বলেই গ্যাসটা তাকে ভালো করে কাবু করতে পারেনি।

মানিক বললে, কিন্তু ঘরের ভিতরে চোরেরা তো ছিল?

জয়ন্ত বললে, যে-সব চোরের এত বেশি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা থাকে, তারা আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে যায়। নিশ্চয়ই তারা গ্যাস-মুখোশ ব্যবহার করেছিল।

সুন্দরবাবু কষ্টেসৃষ্টে এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বিকৃত মুখভঙ্গি করে বললেন, দেখো জয়ন্ত, তোমার রূপকথা বরং সহ্য করতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতে আমার ভুঁড়ির

ওপরে তুমি আজকের মতো এতজোরে ধাক্কা মেরো না। ভুড়ির ওপরে ধাক্কা আমি পছন্দ করি না।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, আপনি এখনও আমার কথা রূপকথা বলে মনে করছেন? বেশ, আসুন আমার সঙ্গে ঘরের ভেতরে!

সকলে আবার বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু ঘরের দরজার কাছে গিয়েই সুন্দরবাবু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সন্দ্বিধাস্বরে বললেন, হুম! জয়ন্ত, যদি তোমার কথাই সত্যি হয়? ঘরের ভেতরে এখনও-ওই যে কি বললে-সেই গ্যাসটা যদি থাকে?

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, না, সে গ্যাস এতক্ষণ থাকবার কথা নয়।

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না ভায়া, মনে তুমি খটকা লাগিয়ে দিয়েছ! প্রাণ বড় মূল্যবান জিনিস হে! ঘরের ভেতরে তুমিই আগে ঢোকো!

জয়ন্ত ও মানিক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। সুন্দরবাবু দরজার ভিতর দিয়ে আগে ভয়ে ভয়ে মাথাটি গলিয়ে দিলেন, ভয়ে ভয়ে তিন-চারবার নিশ্বাস টেনে দেখলেন, তারপর অতি সন্তর্পণে পায়ে-পায়ে ঘরের ভিতরে গিয়েই ব্যস্ত স্বরে বললে, জানলা খুলে দাও-ঘরের ভেতরে বাইরের হাওয়া আসতে দাও।

মানিক জানালাগুলো খুলে দিলে।

জয়ন্ত ঘরের মেঝের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, দেখুন!

সুন্দরবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, সদানন্দবাবুর ঘর থেকে জয়ন্ত যেরকম অতিসূক্ষ্ম কাচের টুকরো বা গুঁড়ো সংগ্রহ করেছিল, এখানেও ঘরময় তেমনি টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে।

জয়ন্ত বললে, দেখুন সুন্দরবাবু, আর এক চোরের শাস্তি দেখুন!

সুন্দরবাবু ফিরে দেখলেন, চৌকির তলায় একটা বিড়াল চার পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে!

জয়ন্ত বললে, ও বিড়ালটা নিশ্চয় কিছু খাবারের লোভে এই ঘরে ঢুকেছিল। তারপর চৌকির তলায় গা-ঢাকা দিয়েছিল আমাদের সাড়া পেয়ে। হাইড্রোজেন আর্সেনাইডে-র মহিমায় এখন ওর অবস্থা কি হয়েছে দেখুন!

সুন্দরবাবু কপালে দুই চোখ তুলে আড়ষ্টভাবে বললেন, ও কি একেবারে মরে গিয়েছে?

একেবারে। ঘরের ভেতরে থাকলে আমাদেরও ওই অবস্থা হত।

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে রইলেন; এবং তারপর অভিভূত স্বরে বললেন, হুম! জয়ন্ত, আজ তুমি আমার প্রাণরক্ষা করলে! এখন আমার মনে হচ্ছে, তুমি সব সময়ে রূপকথা বলো না!

জয়ন্ত আহত স্বরে বললে, সুন্দরবাবু, রূপকথা বলবার বা শোনবার বয়স আমাদের কারুরই নেই। আমি যে রূপকথা বলি না, এর প্রমাণ আগেই আপনি পেয়েছেন। সেই শ্যামপুকুরের চুরির ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি?

সুন্দরবাবু বললেন, না, না, ভুলিনি। সে ব্যাপারে তুমি যথার্থই বাহাদুরি দেখিয়েছিলে বটে! বর্ষার রাতে চোর চুরি করে পালিয়েছিল। বাগানের ভিজে মাটির একটা জায়গা দেখে তুমি বললে, চোর এইখানে পা হড়কে মুখ খুবড়ে পড়ে গিয়েছে। আমরা তোমার কথা গ্রাহ্য করলুম না। কিন্তু তুমি সেইখান থেকে চোরের দুটো হাতের, আর মুখের খানিকটার এমন সুন্দর প্লাস্টারের ছাঁচ তুললে যে, আমরা অবাক হয়ে গেলুম। পরে তোমার সেই ছাঁচের সাহায্যেই চোর ধরা পড়ে শাস্তি পায়! তোমার সে কেরামতির কথা কখনও আমি ভুলব না!

জয়ন্ত বললে, ভবিষ্যতেও আমার কথায় নির্ভর করলে আপনার ক্ষতি হবে না।

সুন্দরবাবু বললেন, কিন্তু ভায়া, আজ যে বড় ভয়ানক কথা শোনা গেল! ইউরোপে আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক চোর আছে বলে শুনেছি, কিন্তু বাংলাদেশেও যে তারা দেখা দিতে

পারে, এটা তো কখনও কল্পনাও করিনি। আর, এরা কেবল চোর নয়, দরকার হলে এরা মানুষ খুন করতেও ভয় পায় না!

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, আমার বিশ্বাস, কলকাতায় ভীষণ একটা দল গড়ে উঠেছে; সে দলের লোকেরা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বা খুন-জখম করতে সর্বদাই প্রস্তুত। এদের যে দলপতি, সে হচ্ছে একজন শিক্ষিত লোক। মুকুন্দ নন্দীর গদিতে আর সদানন্দা বাবুর বাড়িতে যে চুরি হয়েছে, তা একই দলের কীর্তি!

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, তোমার এমন আশ্চর্য বিশ্বাসের কারণ কি জয়ন্ত!

জয়ন্ত বললে, কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আপাতত আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। সদানন্দা বাবুর ঘরে যে কাচের গেলাস পাওয়া গেছে, তার উপরে কার আঙুলের ছাপ আছে, সেটা আপনি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করুন। সেটা যদি কোনও পুরাতন পাপীর হাতের ছাপ হয়, তাহলে আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে যাবে। যদিও ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে একটা বিষয় আমি এর মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলেছি।

মানিক কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি আবিষ্কার করেছ?

জয়ন্ত বললে, লোকে সাধারণত গেলাস ধরে ডান-হাতে। কিন্তু এ গেলাসের ওপর ছাপ আছে বাঁ-হাতের আঙুলের।

মানিক চকিত স্বরে বললে, বাঁ-হাতের আঙুলের! যে আমাদের চিঠি লিখে শাসিয়েছিল, সেও চিঠি লিখেছিল বাঁ-হাতে!

জয়ন্ত বললে, তার কারণও পরে আমরা জানতে পেরেছি। তার ডান-হাতের বুড়ো আঙুল নেই। এখন এটাও আমাদের জানা দরকার, এই গেলাসটা যে ব্যবহার করেছে, তারও ডান হাতের বুড়ো আঙুল আছে কিনা। অবশ্য, আমার এ সন্দেহ অমূলক হতেও পারে। কারণ সময়ে সময়ে আমরা সকলেই ডান-হাত থাকতেও বাঁ-হাতে গেলাস ধরে থাকি।

সুন্দরবাবু এতক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুই চোখ অত্যন্ত বিস্ফারিত করে জয়ন্ত ও মানিকের কথাবার্তা শুনেছিলেন। এখন বললেন, হুম! তোমরা আবার হেঁয়ালির কথা কইতে শুরু করলে। কেন? ডান-হাত বাঁ-হাত,-এসবের অর্থ কি?

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত ছড়িয়ে হাই তুলে বললে, বড্ড পরিশ্রম হয়েছে। সুন্দরবাবু! আজ আর কোনও কথা নয়। এখন আমি ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করব-অর্থাৎ বাঁশি বাজাব!

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, বিশ্রাম করবে-অর্থাৎ বাঁশি বাজাবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাঁশি বাজিয়েই আমি বিশ্রাম করি, আর মানিক বিশ্রাম করে আমার বাঁশি বাজানো শুনতে-শুনতে। এটা আমাদের অনেকদিনের অভ্যাস। না মানিক?

মানিক হাসতে-হাসতে ঘাড় নেড়ে সাই দিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! তোমরা রাগ কোরো না, কিন্তু মাঝে-মাঝে তোমাদের দুজনেরই মাথা দস্তুরমতো খারাপ হয়ে যায় বলেই তিনি প্রস্থান করলেন।

.

দুদিন পরে এক সন্ধ্যাবেলা। জয়ন্ত ও মানিক চা-পান শেষ করে বসে-বসে পরামর্শ করছিল, আজ রাতে বায়স্কোপ দেখতে গেলে কেমন হয়,-এমনসময় নীচের তলা থেকে সুন্দরবাবুর হাঁক-ডাক শোনা গেল।

মানিক হতাশ ভাবে ইজিচেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে বললে, ব্যাস, বিদায় গ্রেটা গার্বোর মায়া-লীলা! ওই শোনো, তোমার সুন্দরবাবু এলেন মুরব্বিয়ানার ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত করতে।

জয়ন্ত চৈঁচিয়ে বললে, আসুন সুন্দরবাবু, ওপরে উঠে আসুন।

সুন্দরবাবু ঘরের ভিতরে ঢুকেই উত্তেজিত স্বরে বললেন, জয়ন্ত, জয়ন্ত, তুমি কি মন্তর টন্তর কিছু জানো?

জয়ন্ত বললে, কেন বলুন দেখি?

সুন্দরবাবু বললেন, তাহলে সেই মন্তরটা আমাকে শিখিয়ে দাও...গেলাসে যার হাতের ছাপ আছে, সত্যিই তার ডান হাতের বুড়ো-আঙুল নেই। কিন্তু পুলিশের কাছে তার বাঁ হাতের ছাপ আছে।

জয়ন্ত দুই টিপ নস্য নিয়ে বললে, তাহলে সে পুরোনো পাপী?

হ্যাঁ। সে ভয়ানক লোক। তার নাম বলরাম চৌধুরী। পঁচিশ বছর আগে সে একটা খুনের মামলার আসামি হয়। কিন্তু বিচারে প্রমাণ-অভাবে খালাস পায়। বিশ বছর আগে একটা ডাকাতির মামলায়ও সে আসামি হয়েছিল। কিন্তু সেবারও সে শাস্তি পায়নি। উনিশ বছর আগে বড়বাজারে রাহাজানি করে সে ধরা পড়ে। এবার সে আইনকে ফাঁকি দিতে পারেনি, বিচারে তার তিন বছর জেল হয়। জেলে থাকতে থাকতেই এক হাবসির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়-

মানিকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, এক হাবসির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়?

হ্যাঁ। তার সঙ্গে বলরাম জেল ভেঙে পালিয়ে যায়। তারপরও এক বছরের ভেতরে তারা যে দুটো খুন আর ডাকাতি করেছে, পুলিশের কাছে এমন প্রমাণ আছে। কিন্তু আমরা কিছুতেই তাদের ধরতে পারিনি। কেবল তাই নয়, তারা যেন পৃথিবী থেকে উবে গিয়েছিল। খুন আর ডাকাতি যাদের জীবিকা, তারা বেশিদিন চুপ করে থাকতে পারে না। কিন্তু আজ ষোলো বৎসরের মধ্যে দেশ-বিদেশের কোথাও তাদের আর কোনও সন্ধানই পাওয়া যায়নি। আমরা ভেবেছিলুম, তাদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আজ এতকাল পরে বলরাম যে কোথা থেকে আবার দেখা দিলে, ভগবান জানেন!

জয়ন্ত বললে, বলরাম যখন এমন গুণী ব্যক্তি, তখন পুলিশ নিশ্চয়ই তার ফটো নিতে ভোলেনি!

সুন্দরবাবু একখানা মোটা বইয়ের পাতা উলটে বললেন, এই দেখো বলরামের ফোটা আর ইতিহাস। এর চেহারা দেখলেই তোমাদের ভয় হবে।

সত্যই তার চেহারা ভয়ঙ্কর, শয়তানের চেহারাও বোধহয় এত ভয়ানক নয়। চোখদুটো সাপের মতো দ্রুর ও তীক্ষ্ণ, নাক বুলডগের মতো খ্যাবড়া, চোয়াল হচ্ছে হাঙরের মতো।

জয়ন্ত অনেকক্ষণ ধরে বলরামের ইতিহাস পড়ে যেন নিজের মনেই বললে, দেখছি এই ফোটাখানা তোলা হয়েছে পঁচিশ বছর আগেই, বলরামের বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর। না, না, এ অসম্ভব!

সুন্দরবাবু শুধোলেন, কী অসম্ভব?

একথা সত্য হলে বলতে হয়, বলরামের বয়স এখন সত্তর বৎসর।

অসম্ভব নয়। আমরা এমন সব পাপীকেও জানি, সত্তর বছর বয়সেও যাদের স্বভাব শোধরায়নি!

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, না সুন্দরবাবু, আমি সেকথা বলছি না। চোরদের দলে যে বুড়ো আঙুল কাটা লোক আছে তাকে স্বচক্ষে দেখেছে আমরা এমন একজনকে জানি। মানিক, কুমোরটুলির চায়ের দোকানে কাজ করে, আমি সেই বেশি-খুশি লোকটির কথাই বলছি। সে তো সেই বুড়ো আঙুল কাটা লোকটিকে বুড়ো বলেনি!

সুন্দরবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, আঙুলের ছাপ মিথ্যা হতে পারে না।

জয়ন্ত বললে, আমার তাই বিশ্বাস। সেইজন্যই তো আমি আশ্চর্য হচ্ছি। তবে কি চোরাদের দলে দুজন বুড়ো আঙুল কাটা লোক আছে? না, তাই বা বিশ্বাস করি কেমন করে? কিন্তু এ ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে?

হঠাৎ মানিক সভয়ে চিৎকার করে উঠল, সাপ, সাপ! অজগর সাপ! সুন্দরবাবু, সাবধান!

জয়ন্ত সচকিতে ফিরে দেখলে, বিপুল এক অজগর সাপ জানালার দুটো গরাদের মধ্যকার শূন্য পরিপূর্ণ করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করছে, এবং তার দুটো ক্ষুধিত চক্ষু দিয়ে ঠিকরে পড়ছে যেন হিংসার আগুন।

অজগরটা বিষম গর্জন করে সুন্দরবাবুকে লক্ষ করে এক ছোবল মারলে, কিন্তু তিনি তার আগেই বাপ বলে বিরাট এক লক্ষ্যত্যাগ করে সরে গেলেন এবং লক্ষ্যচ্যুত অজগরের মাথাটা মাটির উপরে এসে সশব্দে আছড়ে পড়ল।

সেই ভয়াবহ অজগরের দেহের সাত-আট হাত অংশ ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে, কিন্তু তখনও তার দেহের অপর অংশ জানলার বাইরেই অদৃশ্য হয়ে আছে! এমন প্রকাণ্ড অজগর তারা কেউ কখনও দেখেনি!

অজগরটা আবার এক প্রচণ্ড গর্জন করে বিদ্যুৎবেগে মাথা তুললে-এবারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি জয়ন্তের দিকে।

অসম্ভব মৃত্যু যেন মূর্তিমান হয়ে আজ এই ঘরের ভিতরে আচম্বিতে আবির্ভূত হয়েছে।

.

প্রতিশোধ চাই

অজগর আবার মাথা তুলেছে, তার দ্রুত ও তীব্র দৃষ্টি জয়ন্তের দিকে আকৃষ্ট!

জয়ন্তও তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে যথাসময়ে লাফ মারবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল। তখন নিজেকে তার কী অসহায় বলে মনে হচ্ছিল! হাতে এমন কোনও অস্ত্র নেই যে, কোনওরকমে আত্মরক্ষা করে। এখন তার আত্মরক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ক্ষিপ্ৰগতিতে ডাইনে বা বামে অজগরের নাগালের বাইরে সরে যাওয়া। কিন্তু তারপর? তারপর কি হবে? এইটুকু ঘরে এমন ভাবে একটা এত বড় অজগরের আক্রমণ বার বার ঠেকানো তো সম্ভবপর। নয়! এক মুহূর্তের মধ্যে এইসব চিন্তা বিদ্যুতের মতন তার মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল। সঙিন মুহূর্তে মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভাবতে পারে।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে সুন্দরবাবু ভাবছিলেন, এই অজগরটা এখনি তাঁর দেহ জড়িয়ে ধরে হাড়গোড় ছাত্তু করে ফেলে তারপর তাকে গিলে হজম করবে। দুনিয়ায় আজ তার শেষ দিন! তিনি এমন নেতিয়ে পড়লেন যে, সাপটা এখন আবার যদি তাকে ছোবল মারে, তাহলে তিনি আগের বারের মতো আর লম্বা লক্ষ্যত্যাগ করে সরে যেতেও পারবেন না।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই মানিক তিরবেগে হাত বাড়িয়ে সুন্দরবাবুর পকেট থেকে রিভলভারটা একটানে বার করে নিলে। সুন্দরবাবু যখন প্রথম ঘরে এসেছিলেন মানিক তখনই তাঁর পকেটের এই বিশেষত্বটি লক্ষ্য করেছিল।

অজগর আবার সোঁ করে এগিয়ে ছোবল মারতে এল এবং জয়ন্ত সাঁৎ করে একপাশে সরে গেল।

লক্ষ্যচ্যুত হয়ে অবলম্বন না পেয়ে সাপটা আবার মাটির উপরে মুখ খুবড়ে পড়ল। ততক্ষণে তার দেহের প্রায় তিনভাগ ঘরের ভিতর এসে পড়েছে।

অজগর তৃতীয়বার আক্রমণ করবার জন্যে মাথা তোলবার আগেই মানিক তার মাথা টিপ করে উপরি-উপরি দুবার রিভলভারের গুলিবৃষ্টি করল এবং তারপর যে কাণ্ড হল ভাষায় তা ভালো করে বুঝানো যাবে না।

অজগরের ভীষণ গর্জনে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং তার সেই বিপুল দেহটা পাকস্নট খেয়ে ঘরের মেঝের উপরে আছড়া-আছড়ি করতে লাগল-তারই বা শব্দ কি! ঘরের গোল মার্বেলের টেবিলটা ও একখানা সোফা ঠিকরে উলটে পড়ল এবং অজগরের কুণ্ডলীর মধ্যে পড়ে একখানা চেয়ার পলকা দেশলাইয়ের বাস্কের মতোই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অজগরটা রাগে অন্ধ হয়ে সেই ভাঙা চেয়ার লক্ষ করেই উপরি-উপরি দুবার ছোবল মারলে!

ততক্ষণে এই বিষম ধুমধাড়াঙ্কা শুনে বাড়ির অন্যান্য লোকজন ছুটে এসে ঘরের বাইরে দরজার কাছেই স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এবং জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু লাফিয়ে উঠে পড়েছে ঘরের উঁচু খাটের উপরে! সেইখান থেকে মানিক আরও দুবার রিভলভার ছুড়লে। কিন্তু সেই অতিকায় অজগর তবু কারু হয়েছে বলে মনে হল না।

জয়ন্ত চিৎকার করে বললে, বন্দুক, বন্দুক! আমার বন্দুক এনে ছোড়ো!

অজগরের ল্যাজটা একবার উঁচু হয়ে খাটের উপরে আছড়ে পড়ল-মজবুত খাটখানা। ও মড়মড় আর্তনাদ করে উঠল। সে ল্যাজের একটা আঘাত যদি জয়ন্তদের কারুর গায়ে লাগে, তাহলে তখনি তার নিশ্চিত মৃত্যু। অজগরের ল্যাজ সিংহ, ব্যাঘ্র ও বড় বড় মোষকে কাত করে দেয়।

এর মধ্যে কে ছুটে গিয়ে বন্দুক নিয়ে এল। কিন্তু সে ঘরের ভেতরে ঢুকতে সাহস করলে না; দরজার কাছ থেকেই পরে পরে দুবার গুলিবৃষ্টি করলে! মানিকও সাপের মাথা লক্ষ্য করে আর একবার রিভলভার ছুড়লে!

অজগর মারাত্মক আক্রোশে খাটের একটা পায়েকে জড়িয়ে ধরলে, পায়াটা তখনি মড়াত করে ভেঙে গেল এবং খাটখানাও একদিকে নীচু হয়ে পড়ল! টাল সামলাতে না পেরে সুন্দরবাবু খাটের নিচে পড়ে যাচ্ছিলেন, জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে অন্যপাশে সরে গেল।

এই হল অজগরের শেষ-প্রচেষ্টা! তার মাথা তখন গুলির চোটে ঘেঁতলে গুঁড়িয়ে গেছে! কিন্তু সে মরলেও তার দেহ দেখলে সেটা বুঝবার উপায় নেই, তা তখনও পাকসাট খাচ্ছে এবং কুণ্ডলী রচনা করছে-এ কুণ্ডলীর মধ্যে এখনও কোনও জীবজন্তু গিয়ে পড়লে আর তার রক্ষা নেই!

এই প্রাণহীন ভীম অজগরের দেহ তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে ছিল।

সুন্দরবাবু তখন একেবারে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন এবং মানিক খাটের উপরে দুই পা ছড়িয়ে বসে পড়ে গভীর উত্তেজনায় কাতর হয়ে ক্রমাগত হাঁপাচ্ছে।

জয়ন্ত কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, মানিক, আজ তুমি না থাকলে আমরা কেউ বাঁচতুম না!

মানিক হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, সে কথা এখন থাক। দেখো, সুন্দরবাবু হার্ট ফেল করল কিনা!

.

সুন্দরবাবুর যখন জ্ঞান হল তখন তিনি প্রথমেই বলে উঠলেন, আমি বেঁচে আছি তো?

জয়ন্ত বললে, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই।

হুম! সে অজগর ব্যাটা কোথায়?

পরলোকে। তার দেহটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

হুম! আমি আর তোমাদের বাড়িতে আসব না-এই নাক কান মলছি।

কেন সুন্দরবাবু?

কেন? তাও আবার জিগ্যেস করছ! তোমার বাড়ি বিপজ্জনক। সেদিন শুনলুম, হাইড্রোজেন আর্সেনাইডভগবান জানেন, সে কি জিনিস! আজ আবার দেখছি হারিসন রোডের মতো

লম্বা অজগর? কাল আবার এসে হয়তো দেখব আফ্রিকার সিঙ্গি, হিপো, গন্ডার, হাতি। বাপ, এখানে কোনও ভদ্রলোক আসে? হুম, তোমার বাড়িকে নমস্কার, আর আমি এমুখো হচ্ছি না!

মানিক হেসে ফেলে বললে, কিন্তু আপনি তো রিভলভার নিয়ে আসতে পারেন, আপনার ভয়টা কীসের?

সুন্দরবাবু মুখ ভার করে বললেন, ঠাট্টা কোরো না মানিক! ওরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না। কলকাতায় ঘরের ভেতরে অজগর দেখলে রিভলভারের কথা কারুর মনে থাকে?...কিন্তু অজগরটা এল কোথেকে? বাড়ির ওদিকে বাগানের মতো আছে দেখছি! জয়ন্ত, তুমি কি অজগর পোষো?

জয়ন্ত বললে, না! ও-শখ এখনও আমার হয়নি। আমি বাগানে গিয়ে চারিদিকে দেখে এসেছি। খিড়কির দরজা খোলা থাকে না, কিন্তু আজ খোলা রয়েছে। খালের ধারে আমাদের বাড়ির কাছে রাতে লোকচলাচল খুব কম। আমাদের খিড়কির পিছনে একটা সরু কানা গলি আছে-অত্যন্ত নোংরা গলি। সেখান দিয়ে কেউ হাঁটে না। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না; কিন্তু আমার বিশ্বাস, রাত-আঁধারে কেউ বা কারা এসে কোনওরকমে এই অজগরকে নিয়ে বাগানে ঢুকে আমার ঘরের জানালার তুলে দিয়েছে। অজগরটা নিশ্চয়ই তাদের পোষা।

বলো কি! কাদের এ কাজ?

আমাদের শত্রুদের-যাদের কাছে হাইড্রোজেন আর্সেনাইড আছে, যারা মুকুন্দ নন্দীর গদিতে আর সদানন্দবাবুর বাড়িতে চুরি করেছে, যারা চায় না আমরা এব্যাপারের মধ্যে থাকি!

সুন্দরবাবু এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে বললেন, হুম! তাহলে তোমার ধারণা, একই দল মুকুন্দ নন্দীর গদিতে আর সদানন্দের বাড়িতে চুরি করেছে?

ধারণা নয় সুন্দরবাবু, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যেদিন মুকুন্দ নন্দীর গদির ব্যাপারটা হাতে নিই, সেই দিনই কারা আমাদের শাসিয়ে চিঠি লিখেছিল। তারপর সদানন্দবাবুর বাড়ির চুরির পর থেকে আমাদের ওপরে তাদের রাগ যেন আরও বেড়ে উঠেছে। এবার নিয়ে তিন তিনবার আমাদের হত্যা করবার চেষ্টা হল। কিন্তু আর নয়, এইবারে আসল অপরাধীকে অন্ধকার থেকে টেনে বার করতে হবে!

সুন্দরবাবু বললেন, তুমি কি বলরাম চৌধুরীর ওপরে সন্দেহ করো?

জয়ন্ত যেন আপন মনেই বললে, বলরাম চৌধুরী! পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে যে প্রথমে ধরা পড়ে, বহু বৎসর অজ্ঞাতবাসের পরে সত্তর বৎসর বয়সে আবার সে আবির্ভূত হয়েছে। না, না, এ অসম্ভব সুন্দরবাবু, অসম্ভব! নিশ্চয়ই এর মধ্যে গভীর কোনও রহস্য আছে! তাহলে ভবতোষ মজুমদার কে? মানিক, এর মধ্যে ভবতোষকে তুমি নিশ্চয়ই ভোলেনি বিশেষ করে তার চোখ দুটো?

সুন্দরবাবু হতাশজনক মুখভঙ্গি করে বললেন, এই রে, আবার হেঁয়ালি! আচ্ছা জয়ন্ত, থাকো থাকো আর এমন হয়ে যাও কেন বলো দেখি তুমি? হচ্ছিল বলরাম চৌধুরীর কথা, কোথেকে এল আবার ভবতোষ মজুমদার আর তার দুটো চোখ। বলি, তার দুটো চোখ নিয়ে আমরা করব কি? ধুয়ে খাব? হুম, যত অনাসৃষ্টি!

জয়ন্ত বললে, চোখ নিয়ে অনেক কিছু হয় সুন্দরবাবু, অনেক কিছুই হয়! চোখ হচ্ছে মনের আরশি,-সে আরশিতে ভেসে ওঠে লুকানো স্বভাবের আসল ছবি! অসাধুর সমস্ত ছদ্মবেশের ভিতর থেকেই ওই চোখদুটোই তাকে আগে ধরিয়ে দেয়। ভবতোষ মজুমদার হচ্ছে মানুষের নাম, কিন্তু তার চোখ দুটো হচ্ছে শয়তানের চোখ। সে চোখের আসল ভাব ঢাকবার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে! যাবেই তো! চোখের আসল ভাব বেশিক্ষণ কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। ভবতোষও তা পারেনি। তার চোখ দুটো ভীষণ নয়, রহস্যময়!

সুন্দরবাবু বললেন, কী আপদ! কে ভবতোষ? তার চোখের এত ব্যাখ্যানা কেন?

জয়ন্ত বললে, বলব সুন্দরবাবু, তার কথা সব আপনাকে বলব। কিন্তু আপাতত আপনি একটু চুপ করুন-আমার মাথায় একটা ফন্দি আসছে, বোধহয় খুব ভালো ফন্দি!..সুন্দরবাবু, আর একবার চা খেতে আপনার আপত্তি আছে? নেই? ওরে, আমাদের জন্যে তিন পেয়ালা চা দিয়ে যা!..সুন্দরবাবু, একটু ঠান্ডা হয়ে বসুন, সব কথাই আপনাকে বলব!-এই বলে সে জানালার ধারে গিয়ে বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল এবং মাঝে মাঝে এক এক টিপ নস্য নিতে লাগল।

সুন্দরবাবু একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বিরক্তভাবে আপন মনে বললেন, আমি তোমার ভবতোষের চোখের ইতিহাস শুনতে চাই না! চা খেয়েই আমি পাগলা গারদ থেকে পালাব।

খানিক পরেই চাকর চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

জয়ন্ত ফিরে বললে, সুন্দরবাবু, এই চোরদের ধরবার এক চমৎকার উপায় আমি আবিষ্কার করেছি। চা খেতে-খেতে সব কথা আপনাকে বলছি।

আচম্বিতে বাইরে থেকে গুডুম করে একটা বন্দুকের আওয়াজ হল এবং ঘরের দেওয়ালের উপরের একখানা বড় ছবির কাচ ঝনঝন করে ভেঙে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত ধূপ করে মেঝের উপর বসে পড়ল।

মানিক তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গিয়ে আতঙ্কে বলে উঠল, জয়জয়! কী হল? সে সভয়ে দেখলে, জয়ন্তের গাল বেয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে।

সুন্দরবাবু একলাফে উঠে তাড়াতাড়ি ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে দিলেন।

জয়ন্ত গালের উপরে রুমাল চেপে ধরে বললে, ভয় নেই মানিক, ভয় নেই! এ যাত্রাও বেঁচে গেলুম,-গুলি আমার গালের মাংস ঘেঁষে চলে গেছে! জানালার ধারে গিয়ে

দাঁড়ানোই আমার ভুল হয়েছিল। আমি ভাবতে পারিনি যে, অজগর লেলিয়ে দেওয়ার পরেও আমাদের স্যাঙাতরা বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকতে ভরসা করবে।

মানিক বললে, আমরা একী ভয়ানক লোকের পাল্লায় পড়েছি।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! আমি আর চা খাব না। এখান থেকে কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচি।

জয়ন্ত বললে, মুখের চা ফেলে গেলে নরকে পচতে হয়। আসুন, পেয়ালা নিন, আমিও চা খাব। সুন্দরবাবু, যে ফন্দি আমি করেছি, দু-চার দিনের ভেতরেই এই চোর আর খুনির দল। আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা পড়বে। তারা আমাদের রক্তপাত করেছে-আমি প্রতিশোধ চাই।

দুটি হাঁচি ও দ্বাদশ দস্যু

যাকে বলে, রাত ঝাঁ ঝাঁ!

নবমীর চাঁদ এখন মড়ার মতন হলদে-মুখে যেন মিশিয়ে যেতে চাইছে পশ্চিম আকাশে। পৃথিবীর উপরে থমথম করছে না আলো, না অন্ধকার! দেখাও যায়, দেখাও যায় না!

এমন আলো-আঁধারির চেয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঢের ভালো লাগে। সমুদ্রের নীল জলের মতো, শূন্যের কালো অন্ধকার তার ভিতরের সমস্ত বিভীষিকাকে একেবারে ঢেকে রাখে। কিন্তু খানেক তফাতে যদি একটা গাছের ডাল-পাতা নড়ে, এই আলোমাখা অন্ধকারে তাও স্পষ্ট নজরে আসে না সন্দেহ হয় বুঝি কোনও অপার্থিব ছায়া দেখলুম! দূর দিয়ে হয়তো একটা ভীতু শিয়াল ছুটে পালায়, আর আমাদের চোখে ধাঁধা লাগে-বুঝি কোনও ভৌতিক দেহ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

রাতের সভায় আজ জনমানবের সাড়া নেই। কেবল ঝাঁঝিপোকা আর কোলাব্যাঙের দল যেন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটানা চৌঁচিয়ে চলেছে। আর এ-পাড়া ও-পাড়ার কুকুরগুলো থেকে থেকে অকারণেই খাশা হয়ে গলাবাজি করে এ-ওকে দমিয়ে দেওয়ার জন্যে। ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। দুই ধারে সারি সারি বাগানবাড়ি রাত্রের গভীর নির্জনতায় ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে গরিবদের দু-একখানা মেটে ঘর আর ছোট ছোট বস্তি-সেখানেও অনিদ্রার কোনও লক্ষণই নেই। পথের দুধারে তেলের আলোগুলো নাচার হয়ে অত্যন্ত মিটমিট করে জ্বলছে, যেন ঘুমিয়ে পড়তে পারলে তারাও বাঁচে। আশেপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে সজাগ জোনাকিরা কেবল ব্যস্ত হয়ে শূন্যপথে আনাগোনা ওঠা-নামা ছুটোছুটি করছে- তারা যেন স্বপ্নপরিদের ছোট হাতে উড়িয়ে দেওয়া অগুস্তি খেলার ফানুস।

দুখানা বড় বড় মোটরগাড়ি যথাসম্ভব নীরবে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের জানালার জানালার পরদা তোলা, আরোহীদের দেখবার উপায় নেই।

দুখানা গাড়িই একখানা মস্তবড় বাগানবাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে-বাড়িখানার চারিদিক লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। তার কোনও জানালার আলোর আভাসটুকু পর্যন্ত নেই। ফটকও বন্ধ।

সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এই প্রকাণ্ড বাগানবাড়িখানা ভাড়া নিয়েছেন। তিনি মাসখানেকের জন্য কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন। তার নাম নবাব মহম্মদ আলি খাঁ বাহাদুর।

আজ দিন পনেরো ধরে নবাব সাহেবকে নিয়ে কলকাতার লোকদের কৌতূহলের অন্ত নেই। কারণ নবাব-সাহেব হচ্ছেন একজন ধনকুবের। তাঁর হিরা-জহরতের ভাণ্ডার নাকি অফুরন্ত।

এই ভাণ্ডারের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়জনক হচ্ছে একছড়া হিরার হার। অনেক খবরের কাগজে এই অমূল্য রত্নহারের ছবি ও ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে।

সম্রাট জাহাঙ্গির নাকি এই রত্নহারটি নুরজাহানকে উপহার দিয়েছিলেন। তারপরে এই হারছড়া মোগল রাজবংশের ভিতরেই থাকে। নাদির শাহ দিল্লি লুটে ময়ূর-সিংহাসন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোহিনূর ও এই রত্নহারের কোনও সন্ধান পাননি। তারপর ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ এসে কোহিনূরের সঙ্গে ওই রত্নহারও কেড়ে নিয়ে যান। পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ যখন আহম্মদের বংশধরকে হারিয়ে কোহিনূর পুনরাধিকার করেন, তখন রত্নহারটিও তার হস্তগত হয়। তারপর কোহিনূর যায় ইংরেজদের হাতে, কিন্তু কেমন করে ওই হারছড়া যে নবাবসাহেবের পূর্বপুরুষের অধিকারে আসে, সে ইতিহাস কেউ জানে না। সম্প্রতি একজন বড় জহুরি হারছড়া পরীক্ষা করে বলে গেছেন, তার এখনকার বাজারদর এককোটি টাকার কম নয়।

ওই ঐতিহাসিক হারছড়া একবার খালি চোখে দেখে ধন্য হবার জন্যে নবাব-সাহেবের বাড়িতে প্রতিদিন দলে দলে দর্শক এসে ভিড় করেছে। দর্শকদের আগ্রহে বাধ্য হয়ে নবাবসাহেব রত্নহারছড়াকে তার বৈঠকখানার নামিয়ে এনে একটি গ্লাস-কেসের ভিতরে রেখে দিয়েছেন। বৈঠকখানার দরজার দিবারাত্র সর্বদাই একজন সশস্ত্র সেপাই পাহারা দেয়।

এইবারে সেই রহস্যময় মোটরগাড়ি দুখানা কী করে দেখা যাক।

একখানা গাড়ির ভিতর থেকে দুজন লোক নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। তারপর চোরের মতো সন্তর্পণে এগিয়ে নবাব-সাহেবের বাড়ির এপাশে ওপাশে উঁকিঝুঁকি মেলে আবার মোটরের কাছে ফিরে এসে দাঁড়াল।

গাড়ির ভিতর থেকে খুব মৃদুস্বরে কে বললে, পথ সাফ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে।

তার সঙ্গী বললে, কিন্তু ভিতরে বৈঠকখানার সেই সেপাই ঘুমোচ্ছে কিনা জানি না।

গাড়ির লোকটি বললে, তা জানবার দরকার নেই। সেই সেপাইব্যাটা আমার কাছ থেকে অনেক টাকা ঘুষ খেয়েছে। সে আমাদের বাধা দেবে না। বাড়ির ডানদিকের ওই গলিতে যাও। রেলিং উপকে ফটকটা খুলে দাও। সাবধান, যদি কোনও দারোয়ান জেগে ওঠে, তখনই তার মুখ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করবে বুঝেছ? যাও।

অল্পক্ষণ পরেই একে একে বারোজন লোক ঠিক ছায়ামূর্তির মতো নিঃশব্দেই নবাব সাহেবের বাড়ির ফটক পার হল। মোটর দুখানা দূরেই দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু তাদের কল সমানে চলতে লাগল।

নূরজাহানের রত্নহার আজ আবার বুঝি আর একজনের হাতছাড়া হয়।

অনেককালের পুরোনো বাগান-চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাটির উপরে মস্ত মস্ত অন্ধকার সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। আসল মালিকের যে বাগানের সৌন্দর্য-রক্ষার দিকে তেমন দৃষ্টি নেই, তাও বেশ বোঝা যায়। কারণ সর্বত্রই সাজানো ফুলগাছের চেয়ে এলোমেলো ঝোপঝাঁপই বেশি। নবাব-সাহেবের মতো ধনী ও শৌখিন লোকের পক্ষে এরকম বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া উচিত হয়নি।

ওইসব ঝোপঝাপের পাশ দিয়ে, বড় বড় গাছের ছায়ার ভিতর দিয়ে, নিবিড়তর ছায়ার মতো লোকগুলো একে-একে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! কেবল একজন লোক একটা মস্ত আমগাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের প্রতিমূর্তির মতো। বোধহয় সে পাহারা দিতে লাগল।

অতগুলো লোক বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু তবু সেখানে খুব অস্পষ্ট কোনও শব্দও জেগে উঠল না। বাগানও গোরস্থানের মতো নিস্তব্ধ।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতাকে চমকিত করে পাশের ঝোপের ভিতর থেকে কে হেঁচে উঠল- হচ্চো! হচ্চো!

গাছের তলায় যে পাহারা দিচ্ছিল, সে আঁতকে লাফিয়ে উঠল এবং পরমুহূর্তেই ডান হাতের রিভলভার ধরে ঝোপ লক্ষ করে গুলিবৃষ্টি করতে ও বাঁ হাতে একটা বাঁশি বার করে খুব জোরে বাজাতে লাগল।

ঝোপের ভিতর থেকে অমনি কে চৈঁচিয়ে বলে উঠল, হুম! জমাদার, সেপাই, জয়ন্ত!

সারা বাগানখানার ভিতরে চারিদিকে দুদাড় পায়ে শব্দ জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে নানা কণ্ঠের চিৎকার ও ঘন ঘন রিভলভারের শব্দ। রাত্রের সমস্ত তন্দ্রা-স্তব্ধতা ছুটে গেল এক সেকেণ্ডে।

যে ঝোপে হাঁচির জন্ম, তার ভিতর থেকে আবিভূত হল সুন্দরবাবুর বিশাল ভুড়ি। কিন্তু বাড়ির দিক থেকে সাত-আটজন লোক রিভলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে তিরের মতো বোঁ-বোঁ করে ছুটে আসছে দেখে সুন্দরবাবু হুম!-বলে আবার ভুড়িসুদ্ধ ঝোপের ভিতর ঝম্পপ্রদান করলেন।

আরও নানা ঝোপের ভিতর থেকে পাহারাওয়ালার পর পাহারাওয়ালার বেরিয়ে আসতে লাগল-এখানকার সমস্ত ঝোপঝাঁপই যেন কেবল পাহারাওয়ালার ভরা!

খানিক তফাত থেকে জয়ন্তের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল-জমাদার, ওইদিকে। মানিক এইদিকে। আরে-আরে-শিগগির।

সুন্দরবাবু ঝোপের ভিতর থেকে খুব সাবধানে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, আর কেউ এদিকে ছুটে আসছে না। তখন তিনি আর একবার বাইরে লাফিয়ে এসে চৈঁচাতে শুরু করলেন-সেপাই, সেপাই। জলদি। ডাকু-লোক ভাগতা হ্যাঁ। পাকড়ো, পাকড়ো।

জয়ন্ত বেগে ছুটে সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে দেখলে, চোরেরা সকলেই অদৃশ্য হয়েছে, কেবল একজনকে তখনও দেখা যাচ্ছে-পরমুহূর্তে সেও মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

সে আর ইতস্তত করলে না, পলাতকের পায়ে দিকে লক্ষ করে রিভলভার ছুঁড়লে এবং সে-লোকটাও টক্কর খেয়ে মাটির উপরে মুখ খুবড়ে পড়ে গেল।

সুন্দরবাবু মহা আনন্দে নৃত্য করতে করতে বলে উঠলেন, এক ব্যাটা কুপোকাৎ! এক ব্যাটা কুপোকাৎ! উল্লুক, শুয়োর। আমাকে টিপ করে গুলি ছোঁড়া! এখন কেমন জন্ম। বাহাদুর জয়ন্ত।

কিন্তু জয়ন্ত তার কথা কানেও তুললে না, সে আহত লোকটার দিকে ছুটে এগিয়ে গেল- তার পিছনে পিছনে মানিকলাল।

আহত ব্যক্তি মাটির উপরে উঠে বসে দুই হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আচম্বিতে আবার একবার রিভলবারের শব্দ হল এবং সে-ও আতঁনাদ করে আবার ঘুরে পড়ে গেল।

তারপরেই ট্রাক্স রোডের উপর দুখানা মোটরগাড়ি গর্জন করে ছুটে লাগল।

জয়ন্ত যখন সেই ভূপাতিত লোকটার কাছে এসে পড়ল, তখন সে আর নড়ছে না। তাড়াতাড়ি তার বুকে হাত দিয়ে দেখে বললে, মানিক, এ আর এ জীবনে চুরি করবে না!

মানিক বললে, কিন্তু জয়, সবশেষে রিভলভার ছুঁড়লে কে?

চোরেরা। আমি একে মারতে চাইনি, তাই এর পায়ে গুলি করেছিলুম। কিন্তু একে বধ করলে এর দলের লোকেরাই।

সে কী?

হ্যাঁ। পাছে ওদের আহত সঙ্গী সমস্ত গুপ্তকথা ফাঁস করে দেয়, সেই ভয়ে। আমি একে জ্যান্ত ধরবার চেষ্টা করেছিলুম, ওরা আমার সে আশায় ছাই দিয়ে গেল।

এমন সময়ে সুন্দরবাবু সেখানে হাঁসফাঁস করতে করতে এসে হাজির! চিৎকার করে বললেন, কোথায় সেই ডাকাত-ব্যাটা? এইবারে মজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি!

জয়ন্ত তিক্তস্বরে বললে, সুন্দরবাবু, আজ পনেরো দিন ধরে যে ফঁদ পাতলুম-নকল নবাব-সাহেব, ঐতিহাসিক জাল রত্নহার, খবরে কাগজে কাগজে অমূলক আন্দোলন, চোরদের মিথ্যে লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা, কিন্তু সমস্ত পণ্ড করে দিলে আপনার ওই বিদকুটে হাঁচি! আটাশ বছর পুলিশে চাকরি করছেন, দুটো হাঁচি চাপতেও পারলেন না? ঘাটে এনে নৌকো ডোবালেন? ছিঃ!

কিছুমাত্র দমে না গিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, হুম। যেরকম হাঁচি আমার এসেছিল, কোনও ভদ্রলোকই সেরকম বিশ্রী হাঁচি সামলাতে পারে না। আমি অন্যমনস্ক হলাম, মাথা-ঝকানি দিলুম, দু-হাতে মুখ চাপলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না-সে ভয়ঙ্কর ভণ্ডুলে হাঁচি মুখ ঠেলে বেরিয়ে এল একেবারে তেড়েফুঁড়ে! আমার দোষ কি?

জয়ন্ত বললে, আমারই ভাগ্যের দোষ! আর পাঁচ মিনিট পরে হাঁচলে পালের গোদা ভবতোষের সঙ্গে সমস্ত দলটাকেই আমরা গ্রেপ্তার করতে পারতুম।

জয়ন্তের পিঠ চাপড়ে সুন্দরবাবু বললেন, এত সহজে মুষড়ে পোড়ো না ভায়া, ভয় কি? ইস্কুলের কেতাবে পড়ো নি-ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন? চেষ্টা করো, চেষ্টা করো আবার চেষ্টা করো। চেষ্টায় কী না হয়?

মানিক বললে, কিন্তু জয়, তুমি তো সুন্দরবাবুর বাহাদুরিটা দেখছ না! ওঁর দুটি মাত্র। তুচ্ছ হাঁচির ভয়ে বারো-বারোজন জোয়ান ও জ্যাস্ত ডাকাত এক দৌড়ে পালিয়ে গেল! একেই। বলি বীরত্ব!

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে বললে, ঠাট্টা কোরো না মানিক, ও-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না।...হুম! এইবারে দেখা যাক, এ ডাকাতটা কি বলে।

জয়ন্ত শুকনো হাসি হেসে বললে, ও আর এ-জীবনে আপনার সঙ্গে কথা কইবে না।

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, তাহলে ও মরে গিয়েছে?... দেখছি, আজকের যাত্রাই খারাপ! যাক, তবে ওর মুখখানাই দেখি! মানিক, তোমার টর্চটা ওর মুখের ওপর ধরো তো একবার।...ও বাবা, ও কী! ও কি মানুষের মুখ? তিনি চমকে দু-পা পিছিয়ে এলেন।

জয়ন্ত বললে, ভয় নেই সুন্দরবাবু, ও ভূত-টুত নয়। ওর মুখে বিষাক্ত গ্যাস থেকে। বাঁচবার মুখোশ আছে, গ্যাসের মুখোশ দেখতে এমনি বেয়াড়াই হয়!

গ্যাসের মুখোশ? কেন?

আপনি কি এর মধ্যেই হাইড্রোজেন আর্সেনাইডে-র কথা ভুলে গেলেন? এখানেও ওই গ্যাস ব্যবহার করবার জন্যে ওরা প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। এই বলে জয়ন্ত মৃতদেহের মুখোশ খুলে দিলে।

লোকটির দেহ অত্যন্ত বলিষ্ঠ, গায়ের ডুমো ডুমো মাংসপেশিগুলো যেন চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখখানা ভয়ানক, দেখলেই দুর্গা-প্রতিমার অসুরের মুখ মনে পড়ে। কপালের বাঁ দিকে, ভুরুর উপর থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রচণ্ড একটা পুরোনো ক্ষতচিহ্ন,-এমন মারাত্মক চোট খেয়েও কেউ যে বেঁচে থাকতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না!

মানিক শিউরে উঠে বললে, কী ভয়ানক!

সুন্দরবাবু তার মুখ দেখে এমন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যে, খানিকক্ষণ একটাও কথা কইতে পারলেন না। তারপর তিনি অত্যন্ত বিস্মিত স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, না, না-এ অসম্ভব! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে...মানিক, টর্চের আলোটা আরও ভালো করে এর মুখের ওপর ফেলো তো!...না, না, এ যে একেবারে সেই মুখ! কপালের সেই বিষম কাটা দাগটা পর্যন্ত যে মিলে যাচ্ছে! জয়ন্ত, আমার মাথা ঘুরছে, তুমি একবার এর বুকটা খুলে দেখো তো, ডানদিকে একটা এক বিঘৎ লম্বা লাল জড়ুলের দাগ আছে কিনা! আমার ভয় করছে, আমি পারব না।

জয়ন্ত লাশের জামার বোতামগুলো খুলে ফেললে। তার বুকের ডানদিকে সত্যসত্যই একটা এক-বিঘৎ লম্বা লাল জড়ুলের দাগ রয়েছে। সে বললে, সুন্দরবাবু, আপনি একে চেনেন নাকি?

সুন্দরবাবু বললেন, চিনি বললে বলতে হয়, চোখের সামনে আমি একটা ভূতের মড়া দেখছি!...হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। মহম্মদ একবার এদিকে এগিয়ে এসো তো! এ কদিন তো নকল নবাবসাহেব সেজে খুব আয়েস করে নিলে, এখন একটা কাজ করো দেখি! তুমি হচ্ছ আমারই মতো পুলিশের পুরোনো লোক। এই লাশটা কি সনাক্ত করতে পারো?

মহম্মদ এগিয়ে এসে মৃত ব্যক্তিকে দেখেই সভয়ে ও সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল।

সুন্দরবাবু সাগ্রহে বললেন, কে এ মহম্মদ? তুমি চিনতে পেরেছ?

হা হুজুর! এ মহাদেও কাহার।

সুন্দরবাবু চিৎকার করে বললেন, তাহলে আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়,-এ মহাদেও কাহার!

জয়ন্ত বললে, মহাদেও কাহার! কে সে?

সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমি যখন সবে পুলিশে চাকরি নিয়েছি, মহাদেও কাহার ছিল তখন এক নামজাদা ডাকাত। সে নিজের হাতে কত মানুষ খুন করেছে, তা আর গুনে বলা যায় না। অনেক কষ্টে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি। তার ওপরে ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগেই সে জেল ভেঙে পালায়। কিন্তু হাওড়ার পোলের কাছে পুলিশ তাকে আবার ধরে ফেলে। তবু কোনওগতিকে পুলিশের হাত ছাড়িয়ে মহাদেও গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর তাকে বা তার লাশকে পাওয়া যায় না। আমরা সবাই জানি সে মরে গিয়েছে। কারণ আজ সাতাশ বৎসরের মধ্যে মহাদেওকে কেউ চোখে দেখিনি। সাতাশ বৎসর আগে যে গঙ্গাজলে ডুবে মরেছে, আজ সেই মহাদেওর লাশ আবার আমরা খুঁজে পেলুম!

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, না, না সম্পূর্ণ অসম্ভব!

মানিক বললে, এ লোকটার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের বেশি হতে পারে না। এ অসম্ভব কথা।

সুন্দরবাবু বললেন, আমিও বলি, এ অসম্ভব কথা! কিন্তু তার চেয়েও অসম্ভব কি জানো? সাতাশ বছর আগে মহাদেও যখন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তার বয়স ছিল ঠিক পঁয়ত্রিশ বৎসর। তাহলে আজ তার বয়স হত বাষট্টি বৎসর! কিন্তু এই কি বাষট্টি বৎসরের বৃদ্ধের দেহ? অথচ এ যে সেই মহাদেও, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই। সেই মুখ-চোখ, কপালের বাঁদিকে সেই কাটা দাগ, বুকের ডানদিকে সেই জড়ুলের চিহ্ন!

জয়ন্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, বলরাম চৌধুরী। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের পরে অদৃশ্য হয়ে সত্তর বৎসর বয়সে আবার দেখা দিয়ে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি করছে। তার ওপরে আবার মহাদেও কাহার! পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে জলে ডুবেছে, বাষট্টি বৎসর বয়সে ডাঙায় উঠে আবার মরল, কিন্তু এই সাতাশ বৎসরে তার চেহারা একটুও বদলায়নি। আমাদের সকলের মাথাই কি একসঙ্গে বিগড়ে গিয়েছে? যা নয় তাই!

সুন্দরবাবুর তৈরি রিভলভার

জয়ন্ত ও মানিক দুজনে দুখানা ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়েছিল। জয়ন্তের চোখ মোদা-বোধহয় কিছু ভাবছে; মানিকের চোখ খোলা বোধহয় কড়িকাঠ গুনছে।

হঠাৎ মানিক বলে উঠল, জয়, আজকের কাগজ পড়েছ?

জয়ন্ত চোখ বন্ধ রেখেই বললে, না। আজকালকার খবরের কাগজে খবর থাকে না- অর্থাৎ আমি যেরকম খবর চাই।

মানিক বললে, আজকের কাগজ ও কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তোমার মনের মতো খবর দিয়েছে।

জয়ন্ত বললে, আচ্ছা, আগে খবরটা তোমার মুখে শুনি, তারপর আমি চোখ খোলবার চেষ্টা করব।

শ্যামবাজারের মস্ত ধনী তারিণী বিশ্বাসের বাড়িতে কাল রাতে একটা বড় চুরি হয়ে গেছে। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না অদৃশ্য হয়েছে।

হ্যাঁ, এমন খবর শুনে চোখ খুলতে পারা যায় বটে! তারপর?

ঘটনাস্থলে বাড়ির একজন দ্বারবানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কী করে তার মৃত্যু হয়েছে এখনও জানা যায়নি। তার দেহের কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

জয়ন্ত বললে, হাইড্রোজেন আর্সেনাইড!

মানিক বললে, সে কী! তুমি কি এটাও ভবতোষের কীর্তি বলে মনে করো?

খুব সম্ভব তাই। কারণ হাইড্রোজেন আর্সেনাইড যাদের মারে, তাদের মৃত্যুর কারণ ধরা বড় কঠিন। ডাক্তাররা হয়তো ওই দ্বারবানের দেহ পরীক্ষা করে বলবেন, হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে তার মৃত্যু হয়েছে।

মানিক বললে, জয়, ভবতোষের অপরাধ সম্বন্ধে যখন কোনওই সন্দেহ নেই, তখন এমন ভয়ানক লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?

মানিক, তুমি ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ! হ্যাঁ, আমরা জানি বটে এসব কাণ্ডের মূলে আছে ভবতোষই। কিন্তু আদালত তা শুনবে কেন? চাক্ষুষ প্রমাণ কোথায়?

মানিক খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, আচ্ছা জয়, সেই যে মোটরবোট নিয়ে কাফ্রিটা আমাদের আক্রমণ করেছিল, পোর্টপুলিশ তার কোনও পাত্তা পেলে?

জয়ন্ত বললে, ও সে খবরটা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি। সে মোটরবোটখানা যে ভবতোষের এটুকু জানতে পারা গিয়েছে।

মানিক চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললে, তবে? অন্তত আমাদের আক্রমণ করার জন্যে তো মূল চক্রী বলে ভবতোষকে গ্রেপ্তার করা যায়?

জয়ন্ত হেসে বললে, বোসো মানিক, বোসো,-এত ব্যস্ত হোয়ো না। তুমি কি ভবতোষকে এমনই কাঁচাছেলেই মনে করেছ? ভবতোষ এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়েছে...আমার ত্রিবেণীর বাগানের ঘাট থেকে একখানা মোটরবোট আজ দুই দিন হল চুরি গিয়েছে। যিনি তার খোঁজ দিতে পারবেন তাঁকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে-প্রভৃতি।

মানিক বললে, তারপর?

তারপর আর কি, পোর্ট-পুলিশ সেই মোটরবোটখানাকে বাগবাজারের খালের ভিতরে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু বোটে তখন কেউ ছিল না।

মানিক বললে, বুঝেছি। এখন ভবতোষকে প্রশ্ন করলে সে বলবে, বোট যে চুরি করেছে সমস্ত দোষ তার, আর চোর যখন পলাতক, তখন কেউ তাকে ছুঁতেও পারবে না।

জয়ন্ত বললে, হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই দাঁড়িয়েছে বটে। মানিক, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে! খুব ভারী ভারী পায়ের শব্দ। নিশ্চয় সুন্দরবাবু আসছেন-ওঁর ভুড়ির ভারেই পায়ের শব্দ অত ভারী!

সুন্দরবাবু ঘরের ভিতরে ঢুকেই বলে উঠলেন, জয়ন্ত, আমার মান আর চাকরি- দুই-ই বুঝি যায়! আমার এলাকায় উপরি-উপরি এতগুলো চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম-অথচ একটারও কিনারা হল না। কেন বাবা, শহরে তো আরও ঢের থানা আছে, তাদের এলাকায় যা না। একলা আমার ওপরেই এত অত্যাচার কেন?-বলেই তিনি ধপাস করে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন।

মানিক বললে, আপনার সেই দুটো মারাত্মক হাঁচির কথা...সেই বারোজন ডাকাত তাড়ানো বলিষ্ঠ হাঁচির কথা স্মরণ করুন। আপনার মান আর চাকরি যদি যায়, তবে সেই দুটো হাঁচির জন্যেই যাবে!

সুন্দরবাবু বললেন, ঠাট্টা করো না মানিক। মরছি নিজের জ্বালায়, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না!

জয়ন্ত বললে, আচ্ছা সুন্দরবাবু, তারিণী বিশ্বাসদের দ্বারবানের লাশ যেখানে পেয়েছেন, সেখানেও নিশ্চয় খুব মিহি কাচের গুঁড়ো ছড়ানো ছিল?

সুন্দরবাবু সচমকে বলে উঠলেন, হুম! এ কথা তুমি জানলে কেমন করে? হা, কাচের গুঁড়ো ছিল বইকী!

জয়ন্ত বললে, যা ভেবেছি তাই! আবার হাইড্রোজেন আর্সেনাইড। আবার সেই ভবতোষ মজুমদার।

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, তোমার ওই হাইড্রোজেন না মাথামুণ্ডু আর ভবতোষই আমাকে হত্যা না করুক, পাগল না করে ছাড়বে না! এ কী পাচে পড়লুম রে বাবা, কোনও হদিসই পাওয়া যায় না।

এমন সময়ে ঘরে আর-এক ব্যক্তির আবির্ভাব হল। তার পরনে তালিমারা ময়লা কাপড়, গায়ে ধুলোমাখা ছেঁড়াখোঁড়া চাদর আর মাথার চুলগুলো রুম্ম উশকোখুশকো।

তাকে দেখেই সুন্দরবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে রিভলভার বার করলেন, এবং ষাঁড়ের মতো গর্জন করে বললেন, চুপ করে ওইখানে দাঁড়াও! আর এক পা এগিয়েছ কি গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছি!

জয়ন্ত বললে, ভয় নেই সুন্দরবাবু, ভয় নেই! ও শত্রু নয়, আমারই চর!

মানিক বললে, ওঃ, সুন্দরবাবু কি চটপটে! রিভলভার একেবারে তৈরি!

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, ঠাট্টা কোরো না মানিক। তুমি কি জানো না, তোমাদের বাসাটা বাঘের খাঁচার চেয়েও বিপজ্জনক? হাইড্রোজেন না কি আছেন, অজগর সাপ আছেন, আরও যে কত কি আছেন না আছেন, কেমন করে বুঝব বাবা? হুম! ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতরে এমন দুশমন চেহারা দেখলে কার না ভয় হয়?

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, সে কথা ঠিক! কিন্তু আমার এই চরটি যে এখন ছদ্মবেশে আছে! ও আমারই একটা কাজে গিয়েছিল।... তারপর শিবলাল, ব্যাপার কী? কোনও খবর আছে!

আগন্তুক জয়ন্তের কাছে এসে চুপিচুপি বললে, সেই বজরাখানা ঘুষুড়ির কাছে এসে নঙ্গর করেছে। তার সঙ্গে একখানা মোটরবোটও আছে।

আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

শিবলাল অদৃশ্য হল। জয়ন্ত ফিরে বললে, এসো মানিক, আমাদের এখনই বেরুতে হবে। সুন্দরবাবু, আপনি আপাততঃ এখানে বসে বিশ্রাম করুন, চা-টা যা দরকার হবে, হুকুম করলেই আসবে।

আর তোমরা?

আমরা এখন নৌকোয় চড়ে গঙ্গায় বেড়াতে যাব। আমি বাঁশি বাজাব আর মানিক গান গাইবে। এসো মানিক!

জয়ন্ত ও মানিক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু নিজের মনেই বললেন, হুম! বরাবরই জানি, ছোকরাদের মাথা খারাপ! ওরা কি যে বলে আর কি যে করে, কিছুই বোঝবার যো-নেই। আবার বলে গেল, হুকুম করলেই চা পাবেন! বাব্বাঃ! এ-বাড়িতে একলা খানিকক্ষণ থাকলে আর রক্ষে আছে!

আবার সেই আঙুল-কাটা বলরাম চৌধুরী

জয়ন্ত ও মানিক আজকেও একখানা পানসিতে চড়ে ওপারে ঘুঘুড়ির দিকে চলল। দূর থেকেই দেখা গেল, সেই পরিচিত বাহারি বজরাখানা গঙ্গার উপরে ভাসছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে একখানা মোটরবোট।

মানিক জিজ্ঞাসা করলে, সেদিন এই বজরা দেখতে এসেই আমরা বিপদে পড়েছিলুম।
আবার আজ

জয়ন্ত তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বললে, আবার আজ এই বজরা দেখতে গিয়েও
আমরা বিপদে পড়তে পারি। তবু আমি ওখানে যাব।

কেন?

সেদিন ওই বজরাতে উঠেছিলুম বলেই আসল অপরাধীকে চেনবার উপায় হয়েছিল।
আবার দেখতে চাই নতুন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কি না!

কোন অছিলায় বজরায় গিয়ে উঠবে?

বলব, বজরাখানা খুব ভালো লেগেছে, তাই আবার দেখতে এসেছি। কিংবা অন্য কোনও
ছুতো!

ভবতোষ বিশ্বাস করবে কেন?

বিশ্বাস না করুক, বাইরে মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারবে না। খুব সম্ভব, আমাদের সন্দেহ
দূর করবার জন্যে এবারে সে আর কোনও গোলমাল করবে না। আর গোলমাল যদি
করেই, বিপদে যদি পড়ি, তাহলে আমরাও প্রস্তুত। এসব কাজে সিদ্ধি লাভ হয় কেবল

বিপদ আপদের মাঝখান দিয়েই।...এই যে, আমরা বজরার কাছে এসে পড়েছি! মানিক, হুঁশিয়ার থাকো, চোখ-কান সজাগ রাখো।

বজরার উপরে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। সে একদৃষ্টিতে পানসির গতিবিধি লক্ষ্য করছিল।

পানসিখানা বজরার গায়ে গিয়ে লাগল। জয়ন্ত শুধোলে, ভবতোষবাবু আছেন?
আছেন।

আমরা তার সঙ্গে একবার দেখা করব।

ওপরে আসুন।

জয়ন্ত ও মানিক বজরার উপরে গিয়ে উঠল।

ভবতোষবাবু কোথায়?

লোকটা হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিলে।

তারা সেইদিকে এগুলো।...হঠাৎ ছাদে ওঠার সিঁড়ির পাশ থেকে দুজন লোক বেরিয়ে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল! তারাও সতর্ক ছিল, পাশ কাটিয়ে এক লাফে পাশের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সেখানেও জনচারেক লোক যেন তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিল। তারাও এত তাড়াতাড়ি আক্রমণ করলে যে, জয়ন্ত ও মানিক আত্মরক্ষা করবার অবসর পর্যন্ত পেলে না। তারা সকলে মিলে তাদের দুজনের হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেললে। তারপর তাদের সেই অবস্থায় সেইখানেই ফেলে রেখে সকলে বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

শোনা গেল, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে একজন বলছে, হতভাগারা যে এমন বোকার মতো সাধ করে মরতে আসবে, তা আমি জানতুম না! এখন বোটে করে কেউ গিয়ে বড়বাবুকে এই সুখবরটা দিয়ে আসগে যা! তিনি এসে ওদের ব্যবস্থা করুন।

আর-একজন বললে, কিন্তু পানসির লোকগুলো যদি ওদের খোঁজে?

মাঝির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বল যে, বাবুরা এখন যাবেন না।

আর একজনকে বললে, ওদের এ-ঘরে রাখা হয়েছে দেখলে বড়বাবু বোধ হয় রাগ। করবেন।

ওরা নিজেরাই যে ও-ঘরে ঢুকে পড়ল। তা, আজ ওরা ওখানে যা দেখবে, সে কথা। কি পরে আর কারুকে বলবার দিন পাবে? এখন যা, যা-দেরি করিস নে।

তারপর কতকগুলো পায়ে শব্দ এবং তার ওপর সব স্তব্ধ।

বিপদ যে এমন অভাবিতভাবে অতর্কিতে তাদের ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে, জয়ন্ত সেটা কল্পনা করতে পারেনি মোটেই। সে ভেবেছিল, এমন পরিষ্কার দিনের বেলায় এরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা না করলেও এতটা বেপরোয়ার মতো কাজ করবে না, অন্তত খানিকক্ষণ ভাববে এবং তারা যথাসময়েই সাবধান হতে পারবে। সে নিজের সৌভাগ্যের উপর বড় বেশি নির্ভর করে একরকম নির্বোধের মতোই এখানে এসেছিল, ভাগ্যদেবী কিন্তু তার পানে মুখ তুলে চাইলেন না।

মানিকেরও রাগ হচ্ছিল তার বন্ধুর উপরে। মুখ বাঁধা, ভাষায় রাগ প্রকাশ করবার উপায় নেই, তাই অত্যন্ত ভৎসনা ভরা চোখে সে জয়ন্তের দিকে মুখ ফেরালে।

কিন্তু জয়ন্তের মুখ-চোখের অদ্ভুত ভাব দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং তার দৃষ্টির অনুসরণ করে সেও ঘরের একদিকে তাকিয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল।

পরে পরে দুটো কফিনের মতো গ্লাস কেস সাজানো রয়েছে এবং তাদের ভিতরে শোয়ানো রয়েছে কী ও দুটো? মোমের মূর্তি নানা, মৃতদেহ! মানুষের মৃতদেহ!

একটা হচ্ছে অত্যন্ত ঢ্যাঙা এক হাবসির মড়া, তার দেহ যেন কষ্টিপাথরে খোদা!

আর একটা হচ্ছে বাঙালির মড়া। সে-ও খুব লম্বা-চওড়া জোয়ান, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর নির্ধুর ও কুৎসিত তার মুখ যে, দেখলে শয়তানও যেন ভয়ে আঁতকে উঠবে।

আর-আর তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা নেই।

এই কি সেই বলরাম চৌধুরী? কিন্তু তার বয়স তো সত্তর বছর। আর, এক মাথার চুল কালো কুচকুচে, দেহও যুবকের মতোই জোয়ান।

আর, ওই কি সেই হাসিটা, -মোটরবোটে চড়ে সেদিন যে তাদের আক্রমণ করেছিল? কিন্তু তারা মরল কেমন করে? আর তাদের দেহ এমন কাচের কেসেই বা রাখা হয়েছে কেন?

বড়বাবুর আগমন

এ কী অসম্ভব রহস্য। পুলিশের রেকর্ড মানলে বলতে হয়, এই বলরাম চৌধুরী ও হাবসি ভূতটার মৃত্যু হয়েছে বহু বৎসর আগে এবং বেঁচে থাকলেও আজ তারা থুথুড়ো বুড়ো হয়ে পড়ত। কিন্তু এরা এতদিনে মরেওনি, বুড়োও হয়নি! আজ তারা সত্য-সত্যই মরেছে বটে, কিন্তু তাদের দেহে বার্ধক্যের আভাসটুকু পর্যন্ত নেই। তবে কি ওই যৌবনের ভাবটা মিথ্যা, নকল! ওদের দেহের উপরে কি ছদ্মবেশ আছে? এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ, যা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেও ধরা পড়ে না?

আবার মানিকের মনে সেই প্রশ্ন জাগল কিন্তু এরা হঠাৎ মরল কেন এবং কেমন করে? আর, এদের দেহ কফিনে কাচের কফিনে রাখা হয়েছে কেন? যদি ধরে নেওয়া যায়, নতুন

কোনও জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে বা হঠাৎ কোনও অসুখে এরা মারা পড়েছে। এবং ওই হাসিটা হয়তো মুসলমান বা খ্রিস্টান বলেই তার দেহ কফিনে পোরা হয়েছে, কিন্তু বলরাম চৌধুরী? সে তো হিন্দু! তার দেহও কফিনে কেন? আবার যে সে কফিন নয়, কাচের কফিন! কাচের কফিনের কথা কেউ কি কখনও শুনেছে?

নিজেদের মারাত্মক বিপদের কথা ভুলে এই অদ্ভুত রহস্যের কথা ভাবতে-ভাবতে মানিকের মাথাটা যেন গুলিয়ে গেল! মৃতের মৃত্যু! চিরযুবক মানুষ! কাচের কফিন! এর পরেও পৃথিবীর কোনও মাথা না গুলিয়ে থাকতে পারে?

একটা শব্দে চমকে ফিরে মানিক সবিস্ময়ে দেখলে, বন্ধন, রজালের ভিতর থেকে জয়ন্ত ইতিমধ্যেই তার ডান-হাতখানা বার করে নিয়ে নিজের মুখের বাঁধনও খুলে ফেলেছে।

সে হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে দেখে, দড়ির ভিতর থেকে বাঁ-হাতখানা বার করতে করতে জয়ন্ত সহাস্যে বললে, মানিক, আমার এ বিদ্যার কথা জানানো না বলে তুমি বোধ হয় অবাক হয়ে যাচ্ছ? কিন্তু এর মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই। যারা মাসল-কন্ট্রোল করতে পারে, তাদের কাছে এটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওরা যখন আমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধে, তখন আমি দেহের সমস্ত মাংসপেশি দ্বিগুণ ফুলিয়ে রেখেছিলুম। দেহ এখন আবার আলগা করে দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঁধনও শিথিল হয়ে পড়েছে।..ব্যস, আমি এখন স্বাধীন। এসো, তোমার বাঁধনও খুলে দি।

জয়ন্ত মানিকের হাত-পা মুখ আবার খুলে দিলে এবং তারপর তাড়াতাড়ি উঠে কফিনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মানিক বললে, জয়, এসব কি ভূতুড়ে ব্যাপার?

জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কফিনদুটো পরীক্ষা করতে করতে বললে, চুপ, এখন বাজে কথা বোলো না! আমাকে একটু ভালো করে দেখতে আর ভাবতে দাও! আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।

মিনিট পাঁচেক দেহদুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে জয়ন্ত যেন নিজের মনেই অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, হু, তুমি হচ্ছ সেই হাবসি বন্ধু, আর তুমি হচ্ছ আঙুল কাটা বলরাম চৌধুরী। তোমরা সেকেলে লোক, কিন্তু এখনও বুড়ো হওনি-যৌবন তোমাদের হাতে ধরা, তাই না? কিন্তু তোমরা আজ কুপোকাত কেন? তোমাদের দেহে কোনও অসুখ-বিসুখের চিহ্ন নেই, কোনও আঘাতেরও দাগ নেই, তবে তোমরা মরলে কেমন করে? কিন্তু তোমাদের দেহ দেখলে তো মনে হয় না যে, তোমরা পটল তুলেছ? মড়ার দেহ তো রক্তহীন হলদে হয়ে যায়, তোমাদের দেহ তো হয়নি? অথচ তোমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ। আর এই কাচের কফিনেই বা শুয়ে আছ কেন?...ইঁ, জানি তোমরা কোনও জবাব দেবে না! তা জবাব যদি না দাও তো কী আর করা যাবে! হে বন্ধু, ভেবো না, তোমরা জবাব না দিলে আমি কিছুই বুঝতে পারব না। তোমাদের প্রভু ভবতোষ খুব বুদ্ধিমান ভীষণ ধড়িবাজ আর অসাধারণ মানুষই বটে, সৎপথে থাকলে সে আজ অমর হতে পারত। কিন্তু ভবতোষের সব রহস্য আমি বুঝে নিয়েছি-বুঝেছি হাবসি বন্ধু? বুঝেছি বলরাম চৌধুরী? আর কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। ওঃ, মানিক, কি সুক্ষ্ণেই আমরা আজ এই ঘরে বন্দি হয়েছিলাম। আনন্দে আমার অট্টহাস্য করতে সাধ হচ্ছে।

মানিক ব্যস্ত হয়ে বললে, না, না, তুমি অট্টহাস্য কোরো না জয়! এখনও আমরা বন্দি।...কিন্তু হঠাৎ তুমি আবার কি রহস্য আবিষ্কার করলে?

জয়ন্ত বললে, রহস্য বলে রহস্য? এমন রহস্যের কথা পৃথিবীর কেউ কখনও শোনেনি। এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক রহস্য। বিজ্ঞান যে স্বপ্ন দেখেছে, ভবতোষ তাকে সত্যে পরিণত করেছে। কিন্তু সে কথা এখানে গুছিয়ে বলবার সময় হবে না-ওই শোনো, গঙ্গার বুকে দূরে একখানা মোটরবোটের গর্জন শোনা যাচ্ছে!

মানিক কান পেতে শুনে বললে, হা! আমরা বন্দি হয়েছি খবর পেয়ে মোটরবোটে চড়ে ভবতোষ বোধ হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে!

জয়ন্ত চারিদিকে তাকাতে-তাকাতে তাড়াতাড়ি বললে, দেখা করতে নয় মানিক, আমাদের জবাই করতে! যে রহস্য আমরা জানতে পেরেছি, ভবতোষ এর পরে আর এক মুহূর্তও আমাদের বাঁচতে দেবে না। আর এখন আমাদের মরাও অসম্ভব। ভবতোষ হচ্ছে শয়তান-মানুষ-দেহে শয়তান! আমাদের জীবনের উপরে এখন বাংলাদেশের মঙ্গল নির্ভর করছে-মানিক, তুমি জানো না, আমি কি সাংঘাতিক গুপ্তকথা জানতে পেরেছি।

মোটরবোটের শব্দ আরও কাছে এগিয়ে এল।

বজরার বন্ধ-দরজার বাইরে ব্যস্ত পায়ে শব্দ শোনা গেল।

কে একজন বললে, ওরে রামচরণ, শিগগির নেমে আয়। বড়বাবুর বোট আসছে!

জয়ন্ত বললে, হয়েছে! মানিক, ওইদিকের জানালাটা খুলে ফেলো! তারপর এসো, আমরা গঙ্গায় ঝাঁপ দি। এ ছাড়া আর উপায় নেই। কেউ বাধা দিলেই গুলি ছুঁড়বে! তারপর ডুবসাঁতার! কিন্তু ওরা নিশ্চিত হয়ে আছে, বোধ হয় আমাদের পালানো দেখতে পাবে না!

জানালা খুলে আগে মানিক ও পরে জয়ন্ত প্রায়-নিঃশব্দে গঙ্গার জলে গিয়ে ডুব দিলে। বজরার সবাই বড়বাবুর মোটরবোটেরই অপেক্ষা করছে বন্দিদের বন্ধন-মুক্তি তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

বড়বাবু যখন বজরার এসে উঠলেন, জয়ন্ত ও মানিক তখন অনেকদূরে।

.

ক্যারেল সাহেব বাজে লোক নন*

[*পাঠকরা যেন শুষ্ক ও নীরস বলে জয়ন্তের বক্তৃতার অংশ বাদ দিয়ে না যান। এই অংশে যা আছে, তা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য, ওর প্রত্যেক লাইনটি মন দিয়ে না পড়লে এই উপন্যাসের কোনও সার্থকতাই থাকবে না। ইতি-লেখক।]

ঘরের ভিতরে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হতেই জয়ন্ত বলে উঠল এই যে, আসতে আজ্ঞা হোক, এতক্ষণ আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম!..ওরে সুন্দরবাবুর জন্যে চা আর এ পোচ নিয়ে আয়!

সুন্দরবাবু দুই হাঁটু ফাঁক করে ভুড়ির জন্যে স্থান সংকুলান করে বসে পড়লেন। তারপর বললেন, হুম! আজ আমি চা আর এগ-পোচ খেতে এখানে আসিনি। তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ, সেই খুনি-ডাকাতদের সন্ধান দেবে বলে। আগে আমি তাদের চাই।

জয়ন্ত বললে, আজ্ঞে, তারা আমার বাড়িতে এখনও ভ্রমণ করতে আসেনি। তাদের নিমন্ত্রণ করবার জন্যে আমাদেরই যেতে হবে। কিন্তু তার আগে আপাতত আমি একটি বক্তৃতা দেব।

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, বক্তৃতা? আমি কঁকা কথা চাই না, কাজ চাই। আমি কাজের মানুষ। হুম!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বক্তৃতায় স্বদেশোদ্ধারের কথা থাকবে না, কাজের কথাই থাকবে। আমার বক্তৃতা না শুনলে আপনি আসামি ধরতে পারবেন না।

সুন্দরবাবু নাচারভাবে বললেন, তবে দাও তোমার বক্তৃতা!

চা ও এগ-পোচ এল। জয়ন্ত তার বক্তৃতা শুরু করলে –

আপনারা কেউ জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন কিনা জানি না। করলে দেখতে পেতেন, মৃত্যু নিশ্চিত বটে, কিন্তু জীবনকে সুদীর্ঘস্থায়ী করা চলে।

মানুষের দেহ হচ্ছে মেশিনের মতো। মেশিনে কলকবজা বেশিদিনের ব্যবহারে খারাপ হয়ে যায়। তখন সেগুলোকে মেরামত করে নিলে মেশিন আবার সচল হয়।

মানুষের দেহে কলকবজা বিকল হয়ে গেলেও কি মেরামত করা চলে না? চিকিৎসা শাস্ত্রের সৃষ্টি দেহের কলকবজা মেরামত করবার জন্যেই। কিন্তু সাধারণ চিকিৎসকরা মেরামতি কাজ এখনও ভালো করে শিখতে পারেননি।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মতে, সমস্ত জীবন্ত পদার্থই ধরতে গেলে একরকম অমরই বটে। তরুণ জীবের দেহ থেকে টিসু বা বিধানতন্তু নিয়ে তুলে রেখে দিয়ে দেখা গেছে, তার ভিতরকার cell বা অণুকোষগুলি মরে না বরং দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। অসম্পূর্ণ দেহের ঢগটির জন্যেই মৃত্যু হয় এবং সেই জন্যেই tissue বা বিধানতন্তুও মারা পড়ে; নইলে তাদের প্রায় অমর বলা চলে।

মানুষ বুড়ো হয় কেন? তার দেহের ভিতরকার secretion বা সার বা রস শুকিয়ে যায় বলে। বৈজ্ঞানিক Steinach সাহেব অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা রসগ্রন্থি বা gland-এর বিধানতন্তুগুলি আবার কার্যক্ষম করার চেষ্টা করেছেন। Voronoff সাহেব বানরের বিধানতন্তু নিয়ে বুড়ো মানুষের দেহে ঢুকিয়ে তাকে আবার সরস ও তরুণ করে তুলতে চেয়েছেন এবং যথেষ্ট সুফলও পেয়েছেন। এই উপায়েই একেবারে শক্তিহীন, নুয়েপড়া বুড়ো ষাঁড়কে আবার তেজীয়ান যুবক করে তুলতে পারা গিয়েছে।

এইসব দৃষ্টান্ত দেখে বেশ বোঝা যায়, পৃথিবী থেকে মৃত্যুকে তাড়াতে না পারলেও, এবং একেবারে অমর হতে না পারলেও, যৌবন বজায় রেখে মানুষের পক্ষে কয়েক শত বৎসর বেঁচে থাকা হয়তো অসম্ভব নয়!

সুন্দরবাবু হাই তুলে বললেন, ওরে বাবা, আমরা কি মেডিকেল কলেজের মাস্টারমশায়ের লেকচার শুনছি? জয়ন্ত কত ঢং-ই জানে!

তাঁর কথায় কর্ণপাত না করেই জয়ন্ত বলতে লাগল-সুন্দরবাবু, আপনি রজনীগন্ধা গাছ দেখেছেন? জানেন তো তার মূলগুলো তুলে নিয়ে রোদে শুকিয়ে রাখলে তারা মরে? একরকম লিলিজাতের মূলও এইভাবে গুদামজাত করা চলে। পরের বৎসরে যথাসময়ে

সেই মূলগুলো আবার মাটিতে পুঁতলে নতুন গাছে নতুন ফল দেখা যায়। এই জাতের আরও অনেকরকম গাছ আছে। তাদের জীবনীশক্তি অমর।

কিছুদিন আগে বিলাতের টাইমস পত্রে এই খবরটি বেরিয়েছে।

রুশিয়ায় লেনা নদীর মুখে লিরাখোব দ্বীপ। কেপটারেফ সাহেব সেখানে বরফের তলায় আদিম যুগের এমন একটি অরণ্য আবিষ্কার করেছেন, যা শিলীকৃত fossilized হয়নি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, fossil বা শিলক বলতে বোঝায়, যা প্রায় পাথরে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে আর কোনও প্রাণশক্তি থাকে না। কিন্তু ওই অরণ্যের গাছপালা হাজার হাজার বছর পরেও তেমন জড়পদার্থ হয়ে পড়েনি। এইটুকুই লক্ষ্য করবার বিষয়।

গত ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ওই কেপটারেফ সাহেব রুশিয়ার আর এক জায়গায় আর একটি নতুন আবিষ্কার করেছেন। কয়েকজন লোক সোনার খনি বার করবার জন্যে এক স্থানে ষোলো ফুট গভীর করে বরফ কেটেছিল। সেখানেও হাজার হাজার বৎসর আগেকার যেসব গাছপালা ও ঘাস পাওয়া গিয়েছে, তা শিলীকৃত হয়নি। ঘাসগুলো টাটকা ঘাসের মতোই নোয়াতে পারা গিয়েছে।

রুশিয়ার স্কোভেরোডিনো নামক স্থানে কেপটারেফ সাহেব তৃতীয় যে আবিষ্কার করেছেন, তা আরও আশ্চর্য। বারো ফুট গভীর তুষারস্থূপের তলায় পাওয়া গিয়েছে ঘাসের মতন একরকম উদ্ভিদ। নিশ্চয় সেখানে অনেক আগে বোদমাটির জলাভূমি ছিল, উদ্ভিদ হচ্ছে তারই অংশবিশেষ, কিন্তু শিলীকৃত হয়নি। পনেরো দিন পরে ওই কালো উদ্ভিদে ক্রমে সবুজ রং ধরতে লাগল। মাসকয়েক পরে তা শৈবালের আকার ধারণ করলে সামুদ্রিক শৈবাল! বরফের তলায় সুরক্ষিত ছিল বলে হাজার হাজার বৎসর পরেও উদ্ভিদের জীবনী শক্তি নষ্ট হয়ে যায়নি।

সুন্দরবাবু প্রায় আতঁনাদ করে বলে উঠলেন, হুম! থামো জয়ন্ত, থামো! আর আমার সহ্য হচ্ছে না! তুমি কি আমাকেও তোমাদের মতন পাগলা বলে ধরে নিয়েছ? হাজার হাজার

বৎসর আগেকার শৈবালের গল্প আমি আর শুনতে চাই না। আসামির কথা কিছু জানো তো বলো, নইলে আমি থানায় চললাম।

জয়ন্ত বললে, আমার বক্তৃতার আর অল্পই বাকি আছে, আপনি আর একটু ধৈর্য ধরে শুনুন!

এতক্ষণ আমি এই কথাই বোঝাতে চাইছি যে, ঠিকভাবে রাখতে পারলে কোনও সজীব পদার্থই মরে না-অন্তত প্রায় অমর হতে পারে।

দেহের ভিতরে নতুন ও সতেজ রস সঞ্চয় করে বৈজ্ঞানিকরা মানুষকে সহজে বুড়ো হতে দেন না। যতদিন না মানুষ বুড়ো হয় ততদিন মৃত্যু তার কাছে আসে না।

উদ্ভিদ নিম্নশ্রেণির সজীব পদার্থ। হাজার হাজার বৎসর পরেও সে যদি আবার ঘুমন্ত থেকে পূর্ণজীবনের লক্ষণ নিয়ে বেঁচে উঠতে পারে, তবে তার চেয়ে উচ্চশ্রেণির জীব মানুষেরও পক্ষে তা সম্ভবপর হবে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাই আমেরিকার রকফেলার ইনস্টিটিউটের ডা. আলেক্সিস ক্যারেলের কাছ থেকে। সুন্দরবাবু, আপনি ক্যারেল সাহেবের নাম শুনেছেন?

সুন্দরবাবু প্রচণ্ড মাথা নাড়া দিয়ে বলে উঠলেন, ওসব বাজে লোকের নাম আমি শুনতে চাই না। তোমাদের মতো আমারও মাথা খারাপ নয়!

জয়ন্ত হেসে বললে, সুন্দরবাবু, ক্যারেল সাহেব বাজে লোক নন, তার নাম আজ পৃথিবীজোড়া। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

সুন্দরবাবু বললেন, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তাহলে ক্যারেল সাহেব বাজে লোক নন!

জয়ন্ত বললে, আপনার সার্টিফিকেট পেয়ে ক্যারেল সাহেব ধন্য হলেন। এই ক্যারেল সাহেব কি বলেন জানেন? তাঁর মতে, মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করা অসম্ভব

নয়। মানুষের দেহকে মাঝে মাঝে ঘুম পাড়িয়ে যদি দীর্ঘকালের জন্যে গুদামজাত করে রাখা হয় এবং মাঝে মাঝে তাকে যদি গুদাম থেকে বার করে আবার লীলাখেলা করতে দেওয়া হয়, মানুষও তাহলে শত শত বৎসর বাঁচতে পারে।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! হতে পারে তোমাদের ক্যারেল সাহেব নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, হতে পারে তিনি বাজে লোক নন, কিন্তু ওকথা আমি বিশ্বাস করি না।

জয়ন্ত বললে, কেন বিশ্বাস করেন না? প্রাণের লক্ষণ না থাকলেও মানুষের দেহ যে নষ্ট হয় না, এর তো প্রমাণ আছে। আপনি সমাধির কথা শুনেছেন তো? কোনও কোনও যোগীর সমাধিস্থ দেহ এই আধুনিক কালেও মাটির তলায় কবর দেওয়া হয়েছে। প্রায় চল্লিশ দিন পরে মাটি খুঁড়ে সেই মৃতবৎ দেহ উপরে তোলা হয়েছে, তখন তার মধ্যে আবার পূর্ণজীবন ফিরে এসেছে।

সুন্দরবাবু বললেন, হ্যাঁ, একথা আমি শুনেছি বটে।

জয়ন্ত বললে, তবে গুদামজাত করলে মানুষের দেহ নষ্ট হবে কেন? অবশ্য, দেহকে এখানে যোগবলে ঘুম পাড়ানো হবে না-বৈজ্ঞানিকরা রসায়ন-বিদ্যা বা অন্যকিছুর সাহায্য নেবেন। ক্যারেল সাহেব বলেন, মানুষের দেহে ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই তাকে যদি ঘুম পাড়িয়ে গুদামে তুলে ফেলা হয়, তাহলে অনেককাল পরেও তাকে জাগালে সে আবার তাজা আর সবলরূপেই জেগে উঠবে-যেমন নতুন জীবন পায় রজনীগন্ধা,-যেমন নতুন জীবন পেয়েছে কেপটারেফ সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত হাজার হাজার বৎসর আগেকার উদ্ভিদ।

মানিক এতক্ষণ নীরবে একাগ্রভাবে জয়ন্তের কথা শুনছিল, এইবারে সে মৌনব্রত ভঙ্গ করে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, জয়, জয়! এতক্ষণ পরে আমি তোমার বক্তৃতার অর্থ বুঝেছি! তুমি তো এই কথাই বলতে চাও যে, ভবতোষও কোনওরকম রাসায়নিক ঔষধের গুণে মানুষের দেহকে ঘুম পাড়িয়ে গুদামজাত করে ফেলতে শিখেছে?

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, হা!

সুন্দরবাবু ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে বললেন, হুম! জয়ন্ত, তুমি বরং বাঁশি বাজিও আমি সহ্য করব। তোমার আজকের পাগলামি সহ্য করা অসম্ভব। হচ্ছিল ক্যারেল সাহেবের কথা, কিন্তু তার মধ্যেও ভবতোষ? ভবতোষ ভবতোষ করেই তুমি খেপে গেলে দেখছি!

জয়ন্ত বললে, আপনার সঙ্গে আপাতত আমি আর বকতে পারব না, আগে এক পেয়ালা চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে আসি। মানিক, আজকে বজরার গিয়ে আমরা যে দৃশ্য দেখেছি, ততক্ষণ তুমি সুন্দরবাবুর কাছে তা বর্ণনা করো।-এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভিতরে পুনঃপ্রবেশ করে জয়ন্ত দেখলে, ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে প্রকাণ্ড হাঁ করে সুন্দরবাবু স্তম্ভিতের মতন বসে আছেন। জয়ন্তকে দেখে মুখ বুজেই আবার খুলে ফেলে তিনি বলে উঠলেন, এতক্ষণে তোমার লেকচারের মানে বুঝলুম। কিন্তু, এও কি সম্ভব? আর ভবতোষের এমন অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করবার কারণই বা কি?

জয়ন্ত বললে, কারণ কি, বুঝছেন না? যেসব আসামি প্রাণদণ্ড বা গুরুতর শাস্তি পেয়েছে, ভবতোষের আশ্রয়ে তারা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদে ঘুমিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে দেয়। তারা আপত্তি করে না, কেন না মৃত্যুভয়ও নেই, পুলিশের ভয়ও নেই! বরং লাভ আছে, কেন না বুড়ো হবার ভয় নেই! এতে ভবতোষেরও দুরকম সুবিধা। প্রথমত, পাপকাজ হাসিল করবার জন্যে চুরি-জুয়াচুরি-জালিয়াতি-খুন-ডাকাতিতে একেবারে শিক্ষিত পাকা লোকের সাহায্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, পুলিশ যখন বেশি প্রমাণ পেয়ে বেশি গোলমাল করবে, তখন আসামিদের সরিয়ে ফেলে কফিনে পুরে গুদামজাত করলেই হবে। আসল আসামিদের না পেয়ে পুলিশ ভবতোষের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। বলরাম আর সেই হাবসিটা যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটা আন্দাজ করতে পেরেই ভবতোষ নিজের আবিষ্কৃত অদ্ভুত উপায়ে কৃত্রিম মৃত্যুঘুমের সাহায্যে

তাদের আবার সরিয়ে ফেলতে চায়। কোনও গুদামে কাচের কফিনে করে তাদের মৃতবৎ দেহ আপাতত সরিয়ে ফেলা হবে। পাঁচ-দশ বারো বৎসর পরে আমরা যখন তাদের কথা ভুলে যাব, তখন আবার হয়তো তাদের সজীব হবার পালা আসবে! দৈবক্রমে গুদামজাত করবার আগেই আমি সেই হাবসিটার আর বলরামের সমাধিস্থ দেহ দেখে ফেলেছি, তাই রক্ষা, নইলে এ বিষয়ে আমার পড়াশোনা থাকলেও কোনওকালেই আসল ব্যাপারটা হয়তো সন্দেহ করতে পারতুম না। এ যে অস্বাভাবিক কাণ্ড! বৈজ্ঞানিকরা চিরস্থায়ী মানবদেহের স্বপ্ন দেখেছেন বটে, কিন্তু কোনও অজানা মানুষ নিজের পাপ-ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে সেই স্বপ্নকে গোপনে এমনভাবে সত্য করে তুলেছে, আমিও এটা কল্পনা করতে পারতুম না! জানি না ভবতোষের গুদামে এমন আরও কত পাপী ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দিয়ে আবার জাগবে বলে ঘুমিয়ে আছে। পুলিশ তাদের দেখলেও মড়া ছাড়া আর কিছু ভাববে না, ডাক্তারি পরীক্ষাও তাদের মড়া বলেই স্থির করবে, তাদের গুপ্তকথা জানে কেবল ভবতোষই, তাদের জাগাবার ঔষধও আছে কেবল তার হাতেই।

সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আর আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয়। এখনি পোর্ট-পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেলব-তাদের লঞ্চে উঠে সদলবলে সেই বজরা আর ভবতোষকে গ্রেপ্তার করব।

মানিক বললে, তাদের বজরা কি আর সেখানে আছে?

জয়ন্ত বললে, বজরাখানা তারা যদি ডুবিয়ে দিয়ে না থাকে, তাহলে গঙ্গার যেখানেই হোক, তাকে আবার পাওয়া যাবে।

সুন্দরবাবু বললেন, চলো চলো, আর দেরি নয়! এমন আশ্চর্য আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারলে আমার সুনাম আর উন্নতির সীমা থাকবে না।

.

সুন্দরবাবুর বীরত্ব

একখানা লঞ্চ ও একখানা মোটরবোট সশব্দে গঙ্গার জল কেটে হু-হু করে ছুটে চলেছে।
বোটে আছে জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু প্রভৃতি এবং লঞ্চে আছে একদল পুলিশের লোক।

গঙ্গার আর্তনাদে ভ্রক্ষেপ না করে দু-ধারে ফেনার মালা দোলাতে দোলাতে লঞ্চ ও বোট
যখন সাগ্রহে ঘুঘুড়ির কাছে গিয়ে হাজির হল তখন ভবতোষের বজরার চিহ্নটুকু পর্যন্ত
দেখা গেল না!

এটা সকলেই আশা করেছিল। যে ভবতোষ ধারণাতিত শয়তানি চক্রান্তে অদ্বিতীয়, সে
যে বোকার মতন এত সহজে ধরা দেবে, এটা কেহ-ই মনে করেনি।

সুন্দরবাবু বললেন, বজরা আর মোটর-বোট তো ডাঙা দিয়ে হাঁটে না, তাদের জলের
ওপরে কোথাও না কোথাও থাকতেই হবে।

জয়ন্ত বললে, জলের ওপরে না থেকে তারা যদি জলের ভেতরে থাকে? কে বলতে পারে,
তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়নি?...আচ্ছা, খোঁজ নিয়ে দেখা যাক।

খোঁজ পেতে বেশি দেরি হল না। উত্তরদিক থেকে যেসব নৌকা আসছিল, তাদের
একখানার ভিতর থেকে খবর পাওয়া গেল, ত্রিবেণীর খানিক আগে তারা মোটরবোটের
পিছনে একখানা বজরাকে যেতে দেখেছে।

জয়ন্ত বললে, মানিক, তুমি বোধহয় ভোলোনি যে, ত্রিবেণীতে ভবতোষের একখানা
বাগানবাড়ি আছে?

সুন্দরবাবু প্রচণ্ড রোখে বলে উঠলেন, ত্রিবেণী, ত্রিবেণী। চলো সবাই ত্রিবেণীর দিকে!
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন! হুম!

লঞ্চে ও বোটের গতি দ্বিগুণ বাড়ল, তবু সুন্দরবাবু তুষ্ট নন! মহাবিরক্ত স্বরে বার বার
তিনি বলতে লাগলেন, তোমাদের মড়াখেকো লঞ্চ দৌড়ে কচ্ছপকেও হারাতে পারবে না!
আরও জোরে-আরও জোরে! হুম, আমরা হাওয়া খেতে যাচ্ছি না, লড়াই করতে যাচ্ছি?

মানিক চোখে দূরবিন লাগিয়ে বসেছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল, একখানা মোটরবোট এদিকে আসছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সেখানা, আবার তিরের মতো উত্তরদিকে চলে গেল!

জয়ন্ত বললে, ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। বলরাম আর হাবসিটার দেহ লুকিয়ে ফেলে ভবতোষ নিশ্চয়ই পালাবার ফিকিরে ছিল। আমাদের দেখে আবার ফিরে গেল।

সুন্দরবাবু আরও উত্তেজিত হয়ে দুহাতে মাথার চুল টানতে টানতে বললেন, আমরা মোটরবোটে যাচ্ছি, না গাধা-বোটে যাচ্ছি? আমরা লন্ডনে যাচ্ছি, না, ত্রিবেণীতে যাচ্ছি? এ জীবনে কি সেখানে গিয়ে পৌঁছোতে পারব?

লঞ্চ ওবোট উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে-এত জোরে তারা বোধহয় আর কোনওদিন ছোটেনি। বালি-ব্রিজ, ডাইনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, বাঁয়ে বেলুড় ও উত্তরপাড়া পিছনে পড়ে আছে, দু-ধারে আকাশের ভাঙা থামের মতো কলের চিমনিগুলোও তাড়াতাড়ি পিছনে চলে যাচ্ছে এবং গঙ্গার পানসি ও অন্যান্য নৌকোগুলো তাদের উন্মত্ত গতি দেখে এস্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

সুন্দরবাবু বললেন, ওরে, কেউ আমাকে দুখানা ডানা দে না রে! তাহলে আমি এখনি বাজপাখির মতো ভবতোষের ঘাড়ে গিয়ে ছোঁ মারি!

মানিক চোখ থেকে দূরবিন নামিয়ে বললে, ত্রিবেণীর কাছেই আমরা এসে পড়েছি। কিন্তু আকাশের গায়ে ও আগুনের শিখা কীসের?

জয়ন্ত দূরবিনটা মানিকের হাত থেকে নিয়ে নিজের চোখে লাগিয়ে বললে, হুঁ। ওখানে কোথাও আগুন লেগেছে। ত্রিবেণীও তো ওইখানেই।

অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, গঙ্গার ঠিক ধারেই একখানা বাড়ি অগ্নির কবলে পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে! টকটকে লাল শত শত সাপের মতো আঁকাবাঁকা ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে অগ্নিশিখারা ক্রমাগত আকাশকে ছোবল মারবার জন্যে নিষ্ফল চেষ্টা করছে, গঙ্গার তীরে

কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে, অনেকে ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করছে, তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের হই-হই রবে, ভীত পশুপক্ষীদের আর্তনাদে ও অগ্নির প্রচণ্ড গর্জনে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

জয়ন্ত হঠাৎ চৈঁচিয়ে বলে উঠল, ভাই সব! যেখানে আগুন লেগেছে ওইখানে চলো!

সুন্দরবাবু তার চেয়েও জোরে চৈঁচিয়ে বললেন, খবরদার, সিধে চলো। আমার মাথার ভেতরে এখন আগুন জ্বলছে, ও বাজে আগুন দেখবার শখে আর কাজ নেই!

জয়ন্ত বললে, কী মুশকিল! দেখছেন না, যে বাড়িতে আগুন লেগেছে তার সামনের ঘাটেই একখানা বজরা আর মোটরবোট বাঁধা রয়েছে? এই তো ত্রিবেণী। আর আগুন লেগেছে নিশ্চয়ই ভবতোষের বাগানবাড়িতেই!

সুন্দরবাবু পরম বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে বললেন, অ্যাঁ!

জয়ন্ত বললে, খুব সম্ভব, আমরা আসছি দেখে ভবতোষ বুঝে নিয়েছে, তার লীলাখেলার দিন ফুরিয়েছে। সে পালাবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু পথ বন্ধ দেখে আবার এখানে ফিরে এসে নিজের বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে!

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! কেন?

জয়ন্ত বললে, তার বিরুদ্ধে যেসব প্রমাণ আছে সেগুলো নষ্ট করে ফেলবে বলে। এই বাগানবাড়িতেই বোধহয় তার প্রধান আড্ডা।

মানিক বললে, তুমি কি বলতে চাও যে, এই বাড়িতেই ভবতোষের পাপসঙ্গীদের অচেতন দেহগুলো গুদামজাত করা আছে?

আমার তো বিশ্বাস, তাই!

মানিক শিউরে উঠে বললে, কী ভয়ানক! ভবতোষ কি তার বন্ধুদের ঘুমন্ত দেহ আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে চায়?

জয়ন্ত বললে, তা ছাড়া তার পক্ষে উপায় কি? ওই দেহগুলোই যে এখন তার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী!

কথা কহিতে কহিতে জয়ন্ত বরাবরই অগ্নিময় বাড়িখানার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল। হঠাৎ সে ব্যস্ত স্বরে বললে, মানিক, দূরবিন দিয়ে দেখো তো, কে একটা লোক মোটরবোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার ওই বাগানবাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে?

মানিক দেখেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, ওই তো ভবতোষ!

জয়ন্ত বললে, শীগগির ওইখানে চলো। ভবতোষ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে আবার চম্পট দিচ্ছিল। কিন্তু এবারেও পালাতে পারল না, চলো, চলো!

পুলিশের লঞ্চ ও মোটরবোট তিরবেগে তীরের দিকে চলল।

মানিক বললে, বাতাসে কী পেট্রলের গন্ধ!

জয়ন্ত বললে, পেট্রল ঢেলেই ওই আগুন সৃষ্টি করা হয়েছে!

সুন্দরবাবু ভয়ঙ্কর চিৎকার করে বললেন, সেপাইরা, শোনো! বন্দুকে গুলি ভরে নাও! ওই বাগানবাড়ির চারিদিক ঘেরাও করো! ওখান থেকে একটা মাছি বেরুলেও গুলি করে মেরে ফেলবে।

মানিক হেসে বললে, সুন্দরবাবু, আপনার ভুল হল যে! মাছি মারবার জন্যে তো জন্মায় খালি কেরানিরাই। মাছি মারবার জন্যে বন্দুক তৈরি হয় না!

সুন্দরবাবু খাপ্লা হয়ে বললেন, এমন সময়ে ওরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না মানিক। হুম, উনি এলেন আবার কথার ছল ধরতে।

লঞ্চ ও বোট তীরে গিয়ে লাগল। বন্দুকধারী পুলিশ থেকে তখন সেখানকার জনতা আরও বেড়ে উঠেছে সকলেরই মুখে নতুন বিস্ময় ও কৌতূহল, অগ্নিকাণ্ডের দিকে তখন আর কারুরই দৃষ্টি নেই।

সুন্দরবাবু এত চটপট বোট থেকে লাফিয়ে পড়ে বাগানবাড়ির দিকে ছুটে গেলেন যে, দেখলে সন্দেহ হয় না, তার দেহের মাঝখানে মস্ত-ভারী একটা দোদুল্যমান ভুঁড়ি বলে কোনও নিরেট উপসর্গ আছে!

অগ্নিদেবের নৃত্যোৎসব চলেছে তখনও পূর্ণ উদ্যমে। তার চিৎকারও তেমনি নিষ্ঠুর ও প্রচণ্ড! রক্তের আভাষ চারিদিক লাল হয়ে উঠেছে, কুণ্ডলী-পাকানো ধুমে নিশ্বাস রুদ্ধ ও দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, জ্বালাকর উত্তাপে তার কাছে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

কেবল পেট্রলের নয়, আর একটা ভয়াবহ দুর্গন্ধে বাতাস যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মানিকের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত অভিভূত স্বরে বলল, মানিক, শ্মশানের শবদাহের গন্ধ! কতগুলো জীবন্ত দেহ আজ ওইখানে পুড়ে ছাই হচ্ছে, কে তা জানে?

মানিক কিছু বলতে পারলে না, তার প্রাণ তখন যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে সে ভাবলে, ওরা পাপ করেছিল বলেই ওদের এমন শোচনীয় পরিণাম হল—কিন্তু পাপীর হাতেই পাপীর কি ভয়ানক শাস্তি! জীবন্ত পুড়লেও অচেতন ওরা যে সে যন্ত্রণা ভোগ করছে না, এইটুকুই যা সান্ত্বনার কথা।

আচম্বিতে সেই অগ্নিময় বাড়ির ভিতর থেকে একটা মূর্তি টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এল। তার জামা কাপড়ে আগুন জ্বলছে।

সে ভবতোষ, আগুন তাকে বাড়ির ভিতর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আগুনের উত্তাপকে গ্রাহ্য না করে সুন্দরবাবু দ্রুতপদে তার দিকে অগ্রসর হলেন।

উদ্ধান্ত দৃষ্টি তুলে বজ্রকঠিন কণ্ঠে ভবতোষ বললে, যদি বাঁচতে চাও, আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও!

সুন্দরবাবু তবু এগুতে লাগলেন।

ভবতোষ গর্জন করে কি একটা জিনিস ছুড়লে।

জিনিসটা সুন্দরবাবুর কাছ থেকে খানিক তফাতে এসে মাটির উপরে পড়ে বিষম শব্দে ফেটে গেল এবং পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সুন্দরবাবুর দেহ!

জয়ন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল, বোমা, বোমা! ভবতোষ বোমা ছুঁড়েছে!

সকলে ছুটে গিয়ে দেখলে, রক্তাক্ত দেহে সুন্দরবাবু মাটির উপরে বসে আছেন!

কর্কশ কণ্ঠে ভবতোষ বললে, এখনও সরে যাও, নইলে আবার আমি বোমা ছুড়ব!

আহত সুন্দরবাবু হঠাৎ পাশের সেপাইয়ের হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, প্রাণ থাকতে আমি এখান থেকে নড়ব না!

ভবতোষ গুঞ্জন, নিষ্ঠুর অট্টহাস্য করে বললে, আমি তো মরবই, তবে তোরা বেঁচে থাকতে নয়! বলেই সে আবার বোমাসুদ্র হাত তুললে।

কিন্তু চোখের পলক পড়বার আগেই সুন্দরবাবুর বন্দুক গর্জন করে উঠল।

শূন্যে দুই বাহু ছড়িয়ে ভবতোষ ঘুরে মাটির উপর পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের বোমাটা ফেটে গিয়ে রাশিকৃত ধোঁয়ার আড়ালে তাকে একেবারে ঢেকে দিলে।

সেপাইরা যখন ছুটে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল তখন দেখলে, নিজেরই বোমার আঘাতে ভবতোষের কলঙ্কিত দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে!

জয়ন্ত চমৎকৃত গাঢ় স্বরে বললে, সুন্দরবাবু, এতদিনেও আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।
আপনার বীরত্ব আমার মাথা আজ শ্রদ্ধায় নত করে দিয়েছে।

দেহের রক্ত মুহুতে মুহুতে সুন্দরবাবু হাসিমুখে বললেন, হুম!

পরিশিষ্ট

যাঁরা জয়ন্তের কীতি শেষ পর্যন্ত পড়বেন, তাঁরা যে খালি গল্পের জন্যই পড়বেন, এ কথা জানি। কিন্তু জয়ন্তের কীতির মধ্যে গল্প ছাড়াও আর একটি যা লক্ষ করবার বিষয় আছে তা হচ্ছে এই : এটি হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অপরাধের কাহিনি এবং বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে নতুন। এর আখ্যানবস্তু কাল্পনিক হলেও কতকগুলি সত্য তথ্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর নির্ভর করেই তা কল্পনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষের দেহকে জিইয়ে রেখে তাকে যে মৃত্যু ও বার্ধক্যের কবল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে, প্রথম দৃষ্টিতে এটা উপন্যাসিকের অসম্ভব কল্পনা বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু আসলে বহু পরীক্ষার পর আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা ওই অভাবনীয় বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন, অবশ্য, কি এদেশে ও কি পাশ্চাত্য দেশে, ওই বিচিত্র তথ্য বা আবিষ্কার নিয়ে আজ পর্যন্ত উপন্যাস লেখবার কল্পনা আর কোনও লেখক করেছেন বলে জানি না।

তারপর, এই উপন্যাসের মধ্যে অপরাধীরা যেসব নতুন উপায় অবলম্বন করেছে এবং জয়ন্ত যেসব পদ্ধতিতে সেইসব অপরাধ আবিষ্কার করেছে, তাও আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানসম্মত। এদেশে ওরকম বৈজ্ঞানিক অপরাধী ও বৈজ্ঞানিক ডিটেকটিভ এখনও আত্মপ্রকাশ করেনি বটে, কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় তারা যথেষ্ট সুলভ।

বৈজ্ঞানিক চোর, ডাকাত ও খুনেদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পাশ্চাত্য পুলিশও এখন বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে পারে না। কথাসাহিত্যে বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস্

অল্পবিস্তর বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য পুলিশ তার চেয়েও ঢের-বেশি অগ্রসর হয়ে প্রমাণিত করেছে, বাস্তব জীবনের সত্য উপন্যাসের চেয়েও অধিকতর বিস্ময়কর।

ইউরোপে এখন চারিটি দেশের পুলিশ সবচেয়ে বিখ্যাত। এই চারিটি দেশ হচ্ছে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইংলন্ড। আজকাল সব দেশেরই পুলিশ কমবেশি বিজ্ঞানের সাহায্য নেয় বটে, কিন্তু বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার পুলিশকে বিজ্ঞানের দাস বললেও চলে। অস্ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত অধ্যাপকরা আপন আপন রসায়ন-পরীক্ষাগারে বসেই অনেক সময়ে পুলিশকে আশ্চর্যরূপে সাহায্য করে অপরাধী গ্রেপ্তার করবার উপায় বাতলে দেন! একবার পুলিশের সাহায্যকারী এক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ঘটনাস্থলে হাজির না থেকেও আপন পরীক্ষাগারে বসে এমন অভাবিত উপায়ে একটি রহস্যময় আত্মহত্যার কিনারা করে দেন যে, ঔপন্যাসিক কন্যান ডইল সাহেব তার শার্লক হোমসের কীর্তি কাহিনির মধ্যে পাত্র-পাত্রীর নাম বদলে সেই ঘটনাটিকে অবিকল বর্ণনা করেছিলেন।

দুজন মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ এরকম হয় না-এই মস্ত আবিষ্কার হয় প্রথমে বঙ্গদেশের পুলিশ কমিশনার স্যার উইলিয়াম হার্শেলের দ্বারা ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। তারপর ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এখানে অপরাধীদের টিপসই নেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। (কিন্তু তার আগেও চিনারাও আঙুলের টিপ-রহস্য জানত, যদিও অপরাধী ধরবার জন্যে তারা কখনও আঙুলের ছাপ ব্যবহার করত না)। এই প্রথা যখন পাশ্চাত্য দেশেও অবলম্বিত হয়, তখন সেখানকার অপরাধীদের মধ্যে দস্তুরমতো বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ ঘটনাস্থলে গিয়ে অপরাধী কোনও কাচের জিনিসে হাত দিলেই আর রক্ষা নেই। কাচের উপরে অতি সহজেই আঙুলের দাগ পড়ে এবং পুলিশ অনায়াসেই সেই দাগের ফোটো তুলতে পারে। বিলাতী অপরাধীরা তখন হাতে দস্তানা পরে চুরি-ডাকাতি খুন করতে লাগল। তাতেও নিস্তার নেই। কারণ, দস্তানা ঘামে ভিজে গেলেই আবার সেই আঙুলের রেখার ছাপ পাওয়া যায়। তখন অপরাধ করবার পর অনেকে শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে আঙুলের রেখা এমন ভাবে তুলে ফেলতে শুরু করল যে, আগেকার আঙুলের ছাপের সঙ্গে

এখনকার ছাপ যাতে আর না মিলতে পারে! কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হল না। কারণ, ঘষা আঙুলের আগেকার রেখা কিছুদিন পরে অবিকল ফুটে বেরোয়!

এই আঙুলের ছাপ এখন অপরাধী ধরবার একটা প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে এখনও নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হচ্ছে। যে উপায়ে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করা হয়, তাকে বলে লোকার্ডের পোরোস্কোপিক পদ্ধতি (Locards poroscopic method)। ফোটোমাইক্রোগ্রাফির (photomicrography) সাহায্যে ওই পদ্ধতিটি অধিকতর ফলপ্রদ হয়েছে। ফোটোমাইক্রোগ্রাফির দ্বারা আঙুলের খুব ছোট রেখাগুলোর প্রকাণ্ড ছবি তুলতে পারা যায়। এই আঙুলের ছাপ বিচার করবার জন্যে যে রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়, তা micro-chemical examination নামে বিখ্যাত।

সাহিত্যে খুব প্রাচীন একটি ডিটেকটিভের গল্প, পাওয়া যায় বাইবেলে।

বেল ছিলেন বাবিলনের দেবতা। তার পূজার ও সেবার জন্যে রাজা অনেক রকম খাবার সাজিয়ে নৈবেদ্য পাঠাতেন। রাত্রে মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ করা হত। কিন্তু সকালে উঠে দেখা যেত কী আশ্চর্য! পাথরের দেবতা বেল জ্যান্ত হয়ে সব খাবার খেয়ে ফেলেছেন!

দেবতার শক্তি দেখে বেলের মূর্তির প্রতি রাজার ভক্তি শ্রদ্ধার সীমা নেই। তার ফলে দেব-মন্দিরের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও লাভের অঙ্ক বেড়ে উঠল রীতিমতো।

দানিয়েল ছিলেন চালাক লোক। তিনি জানতেন, পাথুরে দেবতা বেলের পেটের ভিতরটাও নিরেট পাথরে ভর্তি হয়ে আছে, রাশি রাশি মিষ্টান্ন, ফল ও মাংস খাবার লোভে সে পেট কখনও ফাঁপা হতে পারে না।

অতএব একদিন তিনি বললেন, মহারাজ, এসব হচ্ছে জোচ্ছুরি আর ধাপ্লাবাজি! বেল এ-সব খাবার খান না!

মহারাজা বললেন, কী যে বলো তার ঠিক নেই। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রাত্রে মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ থাকে। মন্দিরের ভিতরে জনপ্রাণী থাকে না, তবু খাবার কোথায় উড়ে যায়?

দানিয়েল বললেন, আচ্ছা মহারাজ, কাল সকালেই আপনাকে দেখাব, বেল খাবার খান না।

সে রাত্রেও ষোড়শোপচারে বেল-দেবকে ভোগ দেওয়া হল।

তারপর দানিয়েল এসে প্রথমে মন্দিরের মেঝের উপরে সর্বত্র ভালো করে ছাই ছড়িয়ে দিলেন এবং তারপর মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ করে চলে গেলেন।

সকালবেলায় মহারাজা মন্দিরে এলেন দানিয়েলকে সঙ্গে করে। দরজা খোলা হল। মন্দিরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, সমস্ত নৈবেদ্যের থালা একেবারে খালি।

মহারাজ দেবমূর্তির দিকে তাকিয়ে ভক্তিভরে গদগদ স্বরে বললেন, হে প্রভু, হে বেল, তোমার অসীম মহিমা! সত্যই তুমি জাগ্রত দেবতা!

দানিয়েল হেসে বললেন, মহারাজ, ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

মহারাজা ছাই-ছড়ানো মেঝের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বললেন, একী, এখানে এত পায়ের দাগ এল কেমন করে? এ যে দেখছি পুরুষের পায়ের দাগ, মেয়ের পায়ের দাগ, শিশুর পায়ের দাগ! ব্যাপার কী?

দানিয়েল বললেন, ব্যাপার আর কিছুই নয় মহারাজ! পুরুতরা তাদের বউ আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে পিছনের একটা গুপ্তদ্বার দিয়ে মন্দিরে ঢুকে রোজ রাত্রে দেবতার নৈবেদ্য পেট ভরে খেয়ে যায়!

রাজার চোখ ফুটল! পুরুতদের প্রাণদণ্ড হল।

পায়ের ছাপ অবলম্বনে বাবিলনের ওই দানিয়েল মান্ধাতার আমলে গোয়েন্দাগিরি করেছেন। এবং তারপর ওই পায়ের ছাপ আজ হাজার হাজার বৎসর ধরে হাজার হাজার চোর-ডাকাত-খুনির ধরা পড়বার প্রধান কারণ হয়ে আছে!

পায়ের ছাপ দেখে অনায়াসেই বলে দেওয়া যায়, কোন লোক রোগা না মোটা, বেঁটে ঢাঙা, সে খোঁড়া কিনা, সে স্ত্রী না পুরুষ, এবং যদি স্ত্রীলোক হয় তবে গর্ভবতী কিনা। আন্তে-আন্তে চললে একরকম পায়ের ছাপ পড়ে এবং দৌড়লে পড়ে আর একরকম। পায়ের ছাপ পরীক্ষা করবার জন্যে এখনকার ইউরোপীয় পুলিশ সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে।

মাটি থেকে পায়ের ছাপের ছাঁচ তোলবার জন্যে অনেকরকম জিনিসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে-গদ, চর্বি, পাউরুটির গুঁড়ো প্রভৃতি। অনেক পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে, প্লাস্টার অফ প্যারিসই হচ্ছে এ কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। কোথাও পায়ের ছাপ পড়লে আগে নেওয়া হয় তার মাপ ও ফোটোগ্রাফ এবং তারপর প্লাস্টারের ছাঁচ তোলা হয়। বালি, কাদা, ধুলো ও তুষারের উপর থেকে রীতিমত নিখুঁত পদচিহ্নের ছাঁচ তোলা যায়। হালে পরীক্ষা পদ্ধতি এতটা উন্নত হয়েছে যে, আসবাবপত্তরে, সামান্য মিহি ধুলোয় বা চকচকে গৃহতলে বা যে-কোনও রকম কাগজে অস্পষ্ট পায়ের ছাপ পড়লেও তার ছাঁচ তোলা কঠিন হয় না।

পায়ের ছাপ যে পুলিশের কত কাজে লাগে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে বিলাতের একটি গ্রামে এক খুন হয়। মাঠের মাঝখানে একটি লোকের লাশ পাওয়া যায়-হত্যাকারী তার মাথা গুঁড়ো করে দিয়ে তার জিনিসপত্তর লুট করে অদৃশ্য হয়েছিল।

পাশেই খানিকটা তার দিয়ে ঘেরা জমি ছিল। সেই তারের বেড়ার জন্যে যে-সব কাঠের খুঁটি ব্যবহৃত হয়েছিল তার একটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ওপড়ানো খুঁটির গর্তের পাশেই ছিল একটা জুতোসুদ পায়ের ছাপ। সেই ছাপটা মাটির ভিতরে খুব গম্ভীর হয়ে বসে গিয়েছিল।

পুলিশ অনুমান করলে যে, এই খুঁটিটা উপড়ে নিয়ে হত্যাকারী তার সাহায্যেই খুন করেছে। খুঁটিটা খুব জোরে টানাটানি করবার সময়েই তার পায়ের জুতো চেপে মাটির ভিতরে বসে গিয়েছে।

ছাপ পরীক্ষা করে দেখা গেল, খুনির পায়ে বুটজুতো এবং জুতোর তলায় ছিল বড় বড় পেরেক। একটা পেরেক আবার অসাধারণ ও আকারে অন্যগুলোর চেয়ে ঢের বড়। পুলিশ সেই ছাপের ছাঁচ তুলে রেখে দিলে।

ঘটনাস্থলের আশপাশে কড়া পাহারা বসল। এক রবিবার স্থানীয় গির্জা থেকে একটি যুবক বেরিয়ে এল, যার ভাবভঙ্গি সন্দেহজনক। পুলিশের লোক তার পিছু নিলে। পথে এক জায়গায় নরম মাটির উপর দিয়ে যাবার সময়ে, কাদায় তার জুতোর ছাপ পড়ল। তাতেও দেখা গেল একটা বড় আকারের অসাধারণ পেরেকের দাগ। যুবককে তখনি গ্রেপ্তার করে তার জুতোর ছাপের ছাঁচ নেওয়া হল। হত্যাকারীর জুতোর ছাপের ছাঁচের সঙ্গে অবিকল মিল হয়ে গেল! যুবক তখন অপরাধ স্বীকার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ করলে।

রক্তের দাগ হচ্ছে পুলিশের পক্ষে খুনের কিনারা করবার আর এক উপায়। খুনি বলে যার উপরে সন্দেহ করবার কারণ থাকে, তার ঘরে যদি রক্তমাখা জামাকাপড়, অস্ত্র বা অন্য কোনও জিনিস পাওয়া যায়, তাহলে পুলিশের পক্ষে যারপরনাই সুবিধা হয়।

কিন্তু সেকালে খুনির কাপড়ে রক্তের দাগ থাকলে অনেক সময়ে পুলিশের কিছুই বলবার থাকত না। সেদিন পর্যন্ত অনেক আসল খুনিই নিজের জামা-কাপড়ের বা ব্যবহার্য অস্ত্রের উপরকার রক্ত পশু-পক্ষীর রক্ত বলে আইনকে কলা দেখাতে পেরেছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এটা আর হবার যো নেই! এখন কোনও কিছুতে রক্ত লাগলে কিছুকাল পরেও পুলিশ বলে দিতে পারে যে, সে রক্ত মানুষের কি না? এমন কি, তা গোরু বা ভেড়া বা শূকর বা অন্য কোনও পশুর রক্ত কি না, তাও ধরতে পারা যায়। কারণ, মানুষের এবং অন্যান্য পশুর রক্তাণু বা অণুকোষের corpuscles মধ্যে নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। এমনকী, রক্তের বিশেষত্ব অনুসারে মানুষদেরও এখন নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করা

হয়েছে। কাপড়ে রক্তের দাগ দেখলে তা বিশেষ কোনও মানুষের রক্ত বলে এখনও প্রমাণিত করা যায় বটে, কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণির মানুষের রক্ত বলে অনায়াসে ধরা যায়।

জয়ন্তের কীর্তির মধ্যে অপরাধীদের ফোটোগ্রাফের সাহায্যে আখ্যানবস্তুকে অধিকতর জোরালো করে তোলা হয়েছে। এই ফোটোগ্রাফির আবিষ্কার কেবল সাধারণ মানুষকে উপকৃত করেনি, পুলিশের কাজ অনেকদিক দিয়েই যথেষ্ট সহজ করে এনেছে। ধরতে গেলে আঙুলের ছাপ ছাড়া ফোটোগ্রাফির মতো আর কোনও আবিষ্কারই পুলিশকে এত বেশি সাহায্য করেনি।

সকলেই হয়তো জানেন যে, অপরাধীরা প্রায়ই পেশাদার হয়, অর্থাৎ অপরাধই হয় তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। কাজেই প্রত্যেক পেশাদার অপরাধীই জীবনে অনেকবার আইনভঙ্গ করে।

কিন্তু এখন সব দেশেরই পুলিশের চিত্রশালায় প্রত্যেক নবীন ও প্রবীণ অপরাধীর ফোটোগ্রাফ সযত্নে তোলা থাকে। কাজেই কোনও অপরাধের সঙ্গে কোনও পলাতক পুরাতন অপরাধীর সম্পর্ক আবিষ্কৃত হলেই এই ফোটোগ্রাফের সাহায্য নেওয়া হয় নানা ভাবে, এবং ওই অপরাধী পৃথিবীর শেষপ্রান্তে পলায়ন করলেও কেবল, ফোটোর সাহায্যেই তাকে আবার গ্রেপ্তার করবার সুবিধা হয়। আসলে, অপরাধীদের দেহ মুক্তি পেলেও পুলিশের চিত্র কারাগারে তারা চিরকালের জন্যে বন্দি হয়ে থাকে।

কেবল ফোটোর মহিমায় নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণ বা সম্মান রক্ষা পেয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমেরিকার রাইও-ডি জেনিরো বন্দর থেকে এক ইংরেজ তার এক ব্রেজিলিয়ান বন্ধুর সঙ্গে প্রমোদ-তরণীতে yacht চড়ে সমুদ্রে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। কিন্তু সে ফিরে এল তার ব্রেজিলিয়ান বন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে।

ইংরেজ বললে, তার বন্ধু নাকি মাস্তুল থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আহত হয়ে মারা পড়েছেন।

প্রমোদতরীর একখানা দাঁড় পাওয়া গেল না। ডাক্তাররা বললেন, মৃত ব্যক্তির মাথায় যে ক্ষত রয়েছে, দাঁড়ের বাড়ি আঘাত করলেও সেরকম ক্ষত হতে পারে!

তারপরে জানা গেল, নৌকো নিয়ে বেড়াতে বেরুবার দুইদিন আগেই দুই বন্ধুর ভিতরে অত্যন্ত ঝগড়াঝাটি হয়েছিল।

ইংরেজ বললে, কিন্তু সে ঝগড়া স্থায়ী হয়নি। আবার আমাদের ভাব হয়ে গিয়েছিল।

পুলিশ তার কথা বিশ্বাস করলে না। খুনের অপরাধে তাকে চালান দেওয়া হল।

আসামির বাঁচবার কোনও উপায়ই রইল না; কিন্তু হঠাৎ আসামির সপক্ষে এক আশ্চর্য প্রমাণ পাওয়া গেল।

বন্দর থেকে আসামির প্রমোদ তরী যখন বাইরে যাচ্ছিল, তখন একখানা বড় জাহাজ বন্দরের ভিতরে প্রবেশ করছিল।

একজন শখের ফোটোগ্রাফার সেই সময়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে ছবি (Snap-shot) তুলেছিলেন।

ছবি ডেভালপ করে দেখা গেল, একখানা নৌকোর উপরে শূন্যে কি একটা কালো দাগ রয়েছে।

এনলার্জ করবার পর বোঝা গেল, ওই কালো দাগটা আর কিছু নয়, মাস্তুলের উপর থেকে একটি লোক নৌকোর পাটাতনের দিকে পড়ে যাচ্ছে!

ইংরেজ বেচারার বিপদের কথা ফোটোগ্রাফার শুনেছিল। সে তখনি ওই ফটোখানি পুলিশে দাখিল করলে। ফলে ইংরেজটির ফঁড়া কেটে গেল, সে বেকসুর খালাস পেলে।

লাশ বেশিদিন অবিকৃত থাকে না। কিন্তু তার দেহ হত্যাকাণ্ডের অনেকদিন-সময়ে সময়ে কয়েক বৎসর-পরেও পুলিশের কাজে বিশেষ দরকার হয়। এক্ষেত্রেও ক্যামেরার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। উপরন্তু ঘটনাস্থলের সাময়িক ও স্থায়ী ছবি এবং অপরাধকালে ব্যবহৃত নানা জিনিসের ছবিও ওই ক্যামেরার সাহায্যে দেশ-বিদেশে যখন-তখন কাজে লাগানো যায়।

বিশেষ করে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করবার সময়ে এখন সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে ওই ক্যামেরাই (triple extension camera)। আগেই বলেছি, আঙুলের ছাপ ক্যামেরার প্রসাদে তিন-চারগুণ বেশি বড় করে তুললে পরীক্ষার যে কত সুবিধা হয়, তা আর বলবার নয়। দলিল-পত্র সম্পর্কীয় অনেক জটিলতাই আজকাল কেবল ক্যামেরার সাহায্যেই পরিষ্কার করে ফেলা হয়।

কিন্তু কিছু বেশি অর্ধ শতাব্দীর আগে ক্যামেরার সঙ্গে পুলিশের কোনও সম্পর্কই ছিল না- যদিও সত্যিকার ফোটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হয়েছে তার বহু পূর্বে- ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে।

আধুনিক ডিটেকটিভের আর একটি প্রধান সাহায্যকারী হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ। কিন্তু এ-জিনিসটির সঙ্গেও সেকেলে পুলিশ পরিচিত ছিল না। এমনকী ঔপন্যাসিক কন্যান ডইলের মানসপুত্র ডিটেকটিভ শার্লক হোমস্ যখন অপরাধ-রহস্য আবিষ্কারের জন্যে বিশেষরূপে বীক্ষণকাচের সাহায্য নিতেন, সত্যিকার পুলিশ তখনও ওই বিষয় নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে রাজি হয়নি।

কিন্তু আজ তাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে। পুলিশের খাতাপত্র খুঁজলে জানা যাবে, অণুবীক্ষণ অভাবে বহু ক্ষেত্রেই আধুনিক গোয়েন্দাগিরি অচল হয়ে পড়ে।

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে বিলাতে কোল নামে এক কনস্টেবল চোর ধরতে গিয়ে মারা পড়ে। সেই খুনি চোর তার দুর্ভাগ্যক্রমে লাশের কাছে একখানা বাটালি ফেলে গিয়েছিল।

বাটালির তলায় কতকগুলো হিজিবিজি কি দাগ ছিল। খালি চোখ দিয়ে দেখে দাগগুলো বাজে বলেই মনে হয়। কিন্তু ইন্সপেক্টর গম যখন বীক্ষণ কাচ দিয়ে দেখলেন তখন সেই হিজিবিজির ভিতর থেকে হত্যাকারীর নাম স্পষ্ট হয়ে উঠল। ফলে ধরা পড়ে তার ফাঁসি হয়। বীক্ষণ কাচ না থাকলে এ মামলার কোনওই কিনারা হত না। এমন অসংখ্য মামলার কাহিনি এখানে বলা যায়। কিন্তু আমাদের জায়গা নেই!

বীক্ষণকাচ আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করবার সময়েও অপরিহার্য! ঘটনাস্থলে চোর বা হত্যাকারী হয়তো নিজের জামা কাপড়ের দু-একটা অতি-ক্ষুদ্র কণা-পরিমাণ টুকরোও ফেলে গিয়েছে, পরে বীক্ষণ কাচের সাহায্যে সেই তুচ্ছ জিনিস পরীক্ষা করেও বড় বড় অপরাধীকে ধরে ফেলা হয়েছে! জালিয়াতি আবিষ্কার করতেও বীক্ষণকাচ অদ্বিতীয় এবং রক্ত-পরীক্ষাকালেও বৈজ্ঞানিক পুলিশ অণুবীক্ষণ ব্যবহার না করে পারে না।

এই বৈজ্ঞানিক পুলিশের আবির্ভাবে আধুনিক অপরাধ-কাহিনি নতুনতায় বিচিত্র হয়ে উঠেছে, এর কাছে সেকেলে গোয়েন্দা কাহিনি অনেক সময় ছেলেভুলানো গল্প বলেই মনে হয়।